সাত টাকা বারো আনা

সাত টাকা বারো আনা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি. কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র শী

পরম বন্ধুবরেষু

এই লেখকের আমাদের প্রকাশিত বই

সুখ
গৃহসুখ
হাসি কান্না চুনী পান্না
সাত টাকা বারো আনা
গাধা
পুরনো সেই দিনের কথা

সাত টাকা বারো আনা

সাত টাকা বারো আনা

বেশ পাকা পকেটমাররাই মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রী হয়ে জন্মায়। এই মহাসত্য আমার অজানাই থেকে যেত যদি না আমি বিবাহ করতুম। এর মধ্যে আবার আর একটি সত্য আছে। সেটাও আমার আবিষ্কার। পেনিসিলিন আবিষ্কারের মতই আকস্মিক। অথচ সাংঘাতিক। বেদান্ত বলেছেন, সত্য গুহায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনতে হয়। যে স্বামী নাড়ুগোপালের মত হামা দিয়ে প্রাক-বিবাহ পর্বে স্ত্রীরূপী নাড়ু-টিকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরই এই ফাউ সত্যটি লাভ হয়। কি সেই সত্য! প্রেমিকা যদি স্ত্রী হয়ে জীবন-আঙিনায় নৃত্য করতে আসেন, তাহলে তিনি তো নেত্যকালী হবেনই, সেই সঙ্গে 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র মত শুধু পকেটমার নন, চোরও হবেন। অনেকটা অ্যালসেসিয়ান চোরের মত। অ্যালসেসিয়ান চোর জিনিস-টা কি? একটু ব্যাখ্যার দরকার। ছিঁচকে চোর আছে, সিঁদেল চোর আছে, যে বস্তুটি বলছি সেটি কি? অ্যালসেসিয়ানের ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি খুব প্রখর এবং বিশ্বস্ত! সেই অ্যালসেসিয়ান যদি চোর হয় তাহলে প্রেম করে বিয়ে করা বউয়ের মত হবে। এমন বউয়ের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় বড়ো সাংঘাতিক।

বুক পকেটে সাত টাকা আর পাশ পকেটে বারো আনা! জামা ঝুলছে হ্যাঙারে। সংসার খরচের টাকা, আলুকাবলি, ঘুগনি, ফুচকা খাবার টাকা, সিনেমা দেখার টাকা, সবই সেই মহীয়সীর

কাছে জমা করে দিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটি টাকায় লেংচে লেংচে আমার মাস চলে। লোকলৌকিকতা হলে সেই অর্থেও সংসার খাবলা মারে। তখন টিফিনে মুড়ি আর গুটিকয়েক বাদামদানা খেয়ে দিন চালাতে হয়।

প্রেমের তুফানে অর্থনীতির নৌকোর তলা ফেঁসে গেছে। মনকে বোঝাই, ওরে মন, পস্তাও মাত, প্রেম বড়ো পবিত্র মাল। লায়লা-মজনুর কথা স্মরণ কর। রামী-চণ্ডীদাসের কথা ভাব। বিল্বমঙ্গলের উদ্দেশে প্রণাম কর। প্রেম যুগে যুগে। পচা বাদাম চিবিয়ে মুখের বারোটা বেজে গেছে। কুছ পরোয়া নেহি। অধরসুধা পানে চাঙ্গা হয়ে যাবে।

অফিসবারে সকালের দিকেই যত ফ্যাঁকড়া বেরবে। হঠাৎ জগন্নাথবাবু আসবেন। বললেন, আচ্ছা মশাই সিমেন্ট ডিপার্ট-মেন্টে আপনার কেউ জানাশোনা আছে? নেই! হেলথ ডিপার্ট-মেন্টে? তাও নেই! মোটর ভেহিকলস্? তাও নেই! কি আছে আপনার? খালি আপনি আছেন আর আপনার ছায়া আছে? সমাজের কোনও কাজেই লাগবেন না। সমাজবন্ধু হতে পারেন না? ওয়ার্থলেস বাঙালী।

অথবা কাকে স্টেনলেস স্টিলের চামচে ঠোঁটে করে নিয়ে নিম গাছের বাসায় গিয়ে ছেলেকে পুডিং খাওয়াচ্ছে। একটু পেড়ে এনে দাও না গো। জীবনে যে টুলে উঠে বাল্ব পরাতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয়ে মরে, সে উঠবে নিম গাছে! বলো কি ম্যাডাম!

আহা তুমি উঠবে কেন? রকে গোবিন্দ বসে আছে। তাকে গোটা দুই টাকা দিলেই পেড়ে এনে দেবে।

বারো আনা দামের চামচের জন্যে দু'টাকা খরচ।

তা তো বলবেই। তুমি যে সোনার চামচে মুখে দিয়ে জন্মে-ছিলে! আমি বলে কত কষ্ট করে পাঁচ কেজি কাপড় কাচার গুঁড়ো কিনে চামচেটা ফিরি পেয়েছিলুম। সুন্দর চামচে! আমার চামচে!

তোমার চামচে তো কি হয়েছে! ওটা তো নেতার চামচে নয়, যে কাকে নিয়ে গেছে বলে, চলবে না, চলবে না করার লোক কমে যাবে।

মাদ্রাজী মহিলা হলে আমি তোমাকে আজই তালাক দিতুম। জান কি, তাদের স্টেনলেস স্টিলের প্রাণ। কিংবা, আমার সেই প্রেমাঙ্গিনী বাথরুম থেকে বিকচ্ছ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, ওগো শুনছ!

একি? তুমি যে হিন্দী ছবির নায়িকা হয়ে আছ, একেবারে সত্যম শিবম সুন্দরম্। সেনসার না কেটে ছেড়ে দিলে কি করে? এখুনি সামনের আসনের দর্শকরা যে সিটি মারবে!

আঃ! রসিকতা রাখ। কি হবে?

হাউসফুল হবে।

রসিকতা কোরো না। সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার আঙুল থেকে এক ভরির আঙটিটা সিলিপ করে প্যানে পড়ে গেছে।

বাঁচা গেছে।

ওমা সে কি! আমার বিয়ের আঙটি! একবার দেখ না, হরিয়াকে যদি ধরতে পার। হাত ঢুকিয়ে বের করে এনে দিতে পারে কিনা দেখুক।

আজ সেই রকম একটা দিন। শ্যালক আসছেন শোলাপুর থেকে। তিনি চিংড়ির মালাইকারি ছাড়া আর কিছু খান না। ক্ষীর সহযোগে খানছয়েক ফুলকো লুচি চলতে পারে। আর নতুন ফুলকপি উঠেছে। ভাপিয়ে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। শ্যালকের মালমশলা জোগাড় করতে গিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঝুলে গেল। তেড়েফুঁড়ে রাস্তায় বেরোতেই পিতার বয়সী শশাঙ্কবাবু গুপ্ত প্রেস আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়ে এক কূটকচালে প্রশ্ন করে বসলেন। গাদি খেলার কায়দায় ঝুল কেটে পালাতে চাইছি। পথ পাচ্ছি না। সাবেক কালের মানুষ, আমার চেয়ে ভাল খেলেন। কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে দিচ্ছেন না।

মুক্তি যখন পেলুম, তখন আর বাসে যাবার সময় নেই। এদিকে আজই ইনকাম ট্যাক্সের হিয়ারিং-এর দিন। অনেক চেষ্টায় একটা ট্যাকসি ধরে ফেললুম। আগে চাকরি, পরে খরচের হিসেব। গাড়িতে উঠেই মনে পড়ল, পকেটে পড়ে আছে সাত টাকা বারো আনা। সাত টাকা বারো আনায় চার চাকায় চাপা যায় না। ঝাঁকামুটের চার্জও অনেক বেশি।

গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলুম। গোটা পঞ্চাশ টাকা পকেটে রাখা উচিত। যেতে হবে বাম্বুভিলা! সেখানেও কিছু পুজো-অর্চনা আছে। আসতে আসতে পকেটটা একবার চেক করার ইচ্ছে হল। সাত টাকা আছে না গেছে। বুকপকেটটাকে আমি ইচ্ছে করেই হরেক রকম কাগজে ঠেসে রাখি। একে বলে 'অ্যান্টি-পকেটমার ডিভাইস।' টুক করে টাকা তুলে নোব, তা হবে না। বিশল্যকরণীর সন্ধানে জাম্বুবানের মত গন্ধমাদন ঘাড়ে করতে হবে। স্ত্রী মোরে করিয়াছে জ্ঞানী।

লণ্ড্রির বিল বেরুচ্ছে, রেশনের ক্যাশমেমো, কোষ্ঠীর ছক, বাজারের হিসেব, যাবতীয় ভেজাল সবই ঠিকঠাক বুক পকেটে বহাল, টাকা সাতটাই নেই। সর্বনাশ! পাশ পকেটেও তেমন ঝঙ্কার উঠছে না। আধুলি আর সিকি সরব দম্পতির মত সাড়া দিচ্ছে না। সিকি আধুলিকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তার মানে পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে কলকাতা শহরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বেরিয়েছিলুম! আমি কি নাগা সন্ন্যাসী! কুম্ভমেলায় নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াব! মেজাজের এই অবস্থাকেই বলে, বাবু একেবারে ফায়ার।

যে কেশদামে একদা হাত বোলাতে বোলাতে বলতুম, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, সেই কেশভারে তিনি চিরুনি চালাচ্ছিলেন বেশ আয়েশ করে। আমাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। এ কি, ফিরে এলে?

ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ। হুম করে গলা দিয়ে বাঘের মত গর্জন বেরুল।

কি, বড় বাইরে পেয়েছে!

মাঝে মাঝেই আমাকে অসময়ে নিম্নচাপে কাহিল হয়ে ফিরে আসতে হয় ঠিকই, তবে আজ যে অন্য কারণ। দাঁত চেপে বললুম, আজ্ঞে না। সব ঝেড়ে ফাঁক করে দিয়েছ, তোমার কি কোন কালেই আক্কেল হবে না? বলতে কি হয় যে, তোমার পকেট সাফ করে দিয়েছি!

বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, শোবার ঘরে ঢুকে গুপ্তধন খুঁজছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একদিন এক এক জায়গায় টাকা

রাখি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোমেলের ট্যাকটিস। একে বলে ম্যানুভার। যুদ্ধক্ষেত্রে আর সংসারে কোনও তফাত নেই। তিন পাট বিছানার যে-কোনও এক পাটে খামে ভরা গোটা কতক কুড়ি টাকার নোট থাকা উচিত। খাটের চার পাশ। চার পাশের কোন পাশে আছে? মাথার দিকে না পায়ের দিকে? ডান পাশে না বাঁ পাশে। প্রথম পাটে, না দ্বিতীয় পাটে, না তৃতীয় পাটে! সাত ঝামেলায় স্মৃতি এখন এতই বিপর্যস্ত, কিছুই মনে থাকে না। কোথায় টাকা রাখলুম ডায়েরিতে লিখে রাখতে হয়। কম্বিনেশান তালার কোডের মত। এক জায়গায় পর পর দুদিন তো আর রাখা যাবে না।

—কি খুঁজছ অমন হন্যে হয়ে, বল না? হয়ত সাহায্য করতে পারি।

—থাক তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। তুমি এখন সরে পড়।

—বিছানাপত্তর অমন ওলট-পালট করছ কেন? বিছানায় ছারপোকা নেই।

—কি খুঁজছি তুমি ভালই জান। যদি সরিয়ে থাক, দয়া করে খামটা দিয়ে দাও। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—মাইরি বলছি আমি নিইনি। আমি নিলে বলে নিই।

ভাল মানুষের মত মুখ করে তিনি সরে পড়লেন। এখন ডায়েরি ভরসা। সাত তারিখে রেখেছিলুম মায়ের ছবির পেছনে। আট তারিখে বিভূতি গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডের আঠাশ পাতায়। ন'তারিখে দেরাজের তলায়। দশ তারিখে কাপড়ের আলমারির তৃতীয় তাকে হলদে শাড়ির ভাঁজে। মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকতে হয়। ভুলেও ভাবতে পারবে না, তস্করের ডেরায় মাল সাজানো। এগারো তারিখে বাথরুমে সেভিংসেটের ভেতরে। বারো তারিখে পুরনো খবরের কাগজের গাদায়। তেরো তারিখে রেকর্ড-প্লেয়ারের স্পিকারের তলায়। কাল কোথায় রেখেছি? মরেছে, কোনও এনট্রি নেই।

সারা ঘর তোলপাড়। হিঁয়া কা মাল হুঁয়া। গাড়ি হর্ন দিয়ে অধৈর্য প্রকাশ করছে। এখন তিনিই ভরসা। আমারই টাকা

আমাকে চাইতে হবে ভিখিরির মত। এখন আর খোঁজার সময় নেই। পরে এক জায়গায় চোখ বুজিয়ে বসে ধীরে ধীরে ভাবতে হবে। অফিস থেকে এলুম, জুতো খুললুম, অবিনাশ বাইরের ঘরে বসেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোডশেডিং। তারপর, তারপর কি হল! দেশলাই কোথায়, বাতি কোথায়? হই হই, রই রই। তারপর? আর মনে পড়ছে না।

হ্যাঁগা, কোথায় গেলে?

বলো, কি বলছ?

গোটা কুড়ি টাকা দেবে?

কোথায় পাব?

কোথায় পাব মানে! আজ তো সবে পনের তারিখ। সংসার খরচের টাকা নেই!

তোমাকে আমি টাকা দেবো না। তুমি নিলে আর দিতে চাও না। শেষ মাসে বড়ো বিপদে পড়তে হয়। আগে দু'চার টাকা এদিক ওদিক থেকে সরাতুম, পুষিয়ে যেত। এখন কোথায় যে রাখ খুঁজে পাই না।

ও এখন আর সরাও না! আমার দু'টাকার নোটের বাণ্ডিল থেকে রোজই সরছে। জান কি, আমি নম্বর লিখে রাখি!

তোমার সন্দেহ বাতিক।

ও তাই নাকি। তাহলে সকালে সাত টাকা চার আনা সরল কি করে? ক্লিন হাপিস। একবার বলার ভদ্রতাটাও হল না। পথে বেরিয়ে বিপদের একশেষ।

ভুলে গেছি। তুমি সব আনলে, একটু মিষ্টি আনলে না। ওই টাকায় মিষ্টি আসবে।

আবার হর্নের শব্দ। কি, টাকা তাহলে দেবে না?

দিতে পারি এক শর্তে।

ঘড়ি বাঁধা দিতে হবে?

ও তো তোমার ঘড়ি নয়। বাবার দেওয়া।

বেশ, তাহলে আমার বাবার দেওয়া এই সোনার তাবিজ।

ওসব তাবিজ-মাবিজ নয়, কথা দাও আজ রাতেই ফিরিয়ে দেবে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, তোমার ওই ন্যাজে খেলা চলবে না।

বেশ তাই হবে। ফিরে এলে কান ধরে আদায় করে নেবে।

ট্যাকসিচালক বললে, কি মশাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

না, না, ঘুমবো কেন? টাকা খুঁজছিলুম। কোথায় যে রেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

আপনি ব্যাগ ব্যবহার করেন না?

না।

ভালই করেন। ব্যাগ মানেই পকেটমার। ও হবেই হবে। আমার আবার দু-জায়গাতেই ভয়, ভেতরে বাইরে।

আরে মশাই, ভেতরের পকেটেই রাখুন, আর বাইরে পকেটেই রাখুন, পকেটমারের হাত থেকে রেহাই নেই। আমার বাড়িতেও পকেটমার হয়।

ছেলে বুঝি বড় হয়েছে! হিন্দী সিনেমা যতদিন না দেশ থেকে যাচ্ছে ততদিন বাপের পকেট গড়ের মাঠ হবেই।

ছেলে নয় মশাই, স্ত্রী। সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস।

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। ওকেই বলে খাল কেটে কুমির আনা। আপনি আমার মত করতে পারেন।

কি বলুন তো?

সেরেফ চোরের ওপর বাটপাড়ি।

যেমন?

আপনিও চুরি করে ফাঁক করে দিন।

ও বাব্বা, সে একবার চেষ্টা করে দেখেছি। কোথায় যে রাখে! রান্না ঘরে শ'খানেক কৌটো। কোনটার মধ্যে যে মাল আছে, কে জানে?

ওদের টাকা রাখার ফিকসড কতকগুলো জায়গা আছে। যেমন মিটসেফ, চালের টিন, ছাড়া শাড়ির আঁচল, বালিশের খোল। একটু চেষ্টা করলেই সন্ধান পেয়ে যাবেন!

আমি তো খুচরো পয়সা কোনোদিন চোখেই দেখতে পাই না। এই আছে, এই নেই।

খুচরো বাড়িতে ঢোকাবেন না। শেষ নয়া পয়সা শেষ করে বাড়ি ঢুকবেন। অন্যের হাতে যাওয়ার চেয়ে নিজের হাতেই যাওয়া

ভাল! খরচ করার আর কোনও রাস্তা না পেলে শেষ দশ পয়সায় একটা ওজন নেবেন।

সময় বিশেষে অন্যের কাছে নিজের স্ত্রীর নিন্দে করতে পারলে মনটা বেশ হাল্কা হয়ে যায়। সর্বক্ষণ আমার সেই এক কাজ, নিজেকে অনুসরণ করা। অবিনাশ। কথা বলতে বলতে লোড-শেডিং। দেশলাই, বাতি, আমার জামা ছাড়া, তারপর পকেট থেকে টাকার খাম বের করে কোথায় যেন রাখলুম। কোথায় যেন রাখলুম। বাথরুমে?

ইনকাম ট্যাকস অফিসার কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, খেয়াল করিনি। বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, কি মশাই ভাবসমাধি হয়ে গেল নাকি?

কি বলতে কি বললুম। কোথায় রেখেছি বলুন তো?

কি রেখেছেন? কালো টাকা? ধমকের সুর?

আজ্ঞে না, সাদা টাকা।

সাদা টাকা আর নেই। সবই কালো। কই দেখি, রেন্ট রিসিটটা দিন।

বাম্বুভিলা থেকে বেরিয়ে অফিসে আসার পথে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। নাও, বোঝো ঠ্যালা। ট্যাক্সি ভাড়া মেটাবার পর পকেটে মাত্র ছটা টাকা পড়ে আছে। যাই হোক চটিটাকে টানতে টানতে এক মেরামতঅলার কাছে নিয়ে এলুম। আজকাল যা বাজার পড়েছে, দেড়টা টাকা খসে গেল। কোন কোন পেশায় মানুষের বিপদটাই হল মূলধন। চাপ দিয়ে রস বের করার মত নিঙড়ে টাকা বের করে নাও। ট্যাকসের ফাঁড়া কাটতে না কাটতেই আর এক ফাঁড়া। ছেঁড়া চটি সারাতে বিদ্যুৎ-চমকের মত পূর্ব রাতের স্মৃতি ফিরে এল। মনে পড়েছে, কোথায় রেখেছি টাকা। মোক্ষম জায়গা। কারুর বাবার ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে। আমার নিউকাট জুতোর শুকতলার ভেতরে এমন একটা জায়গা অন্য কারুর কল্পনায় আসবে না। যাক, এখন আমার কাজে মন আসবে। ঘিনঘিনে চিন্তাটা চলে গেল। সারা মাসের রসদ। হারালেই হাতে হারিকেন।

সন্ধের পরে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলুম। আসতে

আসতে ভাবছি, শ্যালক মহারাজ এতক্ষণে তোফা চিঁড়ে, বাদাম ভাজা খাচ্ছেন। একটু পরেই ফুলকো লুচি, চিংড়ির মালাইকারি। কিন্তু কোথায় সেই দশাসই ঘরজোড়া নয়নলোভন, ব্যাঘ্রলালা-উৎপাদনকারী শ্যালক মহোদয়! আমার স্ত্রী রত্নটিই বা কোথায় গেলেন!

মানুর মা বললে, জামা কাপড় ছাড়ুন, চা করে দিচ্ছি।

ওরা কোথায় গেল?

বউদিরা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। বেলাবেলিই গেছেন। ফিরে আসার সময় হয়েছে।

যাক বাবা, ওরা আসার আগে গুপ্তস্থান থেকে টাকাটা বের করে রাখি। দেখতে পেলে হাসাহাসি করবে। জুতোর র‍্যাকে ছেঁড়া খোঁড়া জুতো, জুতোর বাকসের অভাব নেই। এক জোড়া বাইশ শো বাইশ হাফ-বুট শ্যালকের মতই খুশ মেজাজে বসে আছে। কিন্তু আমার নিউকাট-জোড়া কোথায়? জুতো কি মালিক ছাড়াই বেড়াতে বেরিয়ে গেল!

মানুর মা, এখানে আমার এক জোড়া জুতো ছিল, কোথায় গেল জান কি?

জুতো! মনে হয় দাদাবাবু প'রে গেলেন। বউদি আপনার ধুতি-পাঞ্জাবি বের করে দিলেন, তারপর জুতোটা পায়ে গলিয়ে দাদাবাবু বললেন, বেশ ফিট করেছে। বউদি বললেন, তাহলে ওইটাই প'রে চল। বেশ জামাই জামাই দেখাচ্ছে।

সে কি! জুতো আর চশমা, হ্যাঁ আর একটি বস্তু, স্ত্রী, যার যার, তার তার, এই রকমই তো শুনে এসেছি এতকাল। নয়া জমানায় স্ত্রী হাত-পালটাপালটি হয়, আজকাল হামেশাই হচ্ছে। জুতো ফিট করেছে বলে প'রে চলে গেল। যেমন বউ তার তেমনি ভাই। সব যেন গামছা হাতে জন্মেছে। গামছাবতার। লম্বা গলা দেখলেই লাগাও আর মারো টান। পঁয়তাল্লিশ টাকার জুতোর শুকতলায় পাঁচখানা কুড়ি টাকার নোট। জুতো ছেড়ে মন্দিরে ঢুকবে। জুতো-চোর মুখিয়ে থাকবে। ধর্মের স্থানেই যত অধার্মিকের উৎপাত। হয়ে গেল। একেই বলে গ্রহ। পেয়েও হারালুম।

সাতটা বাজল, সাড়ে সাতটা বাজল। খবর শেষ হয়ে গেল। দুই মালের তবু দেখা নেই। গেছে তো গেছেই। মানুর মা বসে বসে ঢুলছে। দুধ ওতলানোর মত একশো টাকার শোক মনে উথলে উথলে উঠছে। উদাসীনতার পাখার বাতাস মারছি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

পৌনে ন'টা নাগাদ গাড়ি থামার শব্দ হল! উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। শ্যালকের জন্যে নয়, জুতোর জন্যেই উতলা হয়ে দরজা খুলে বাইরে ছুটে গেলুম। রোমান্সের সবুজ পাতা কবে শুকিয়ে ঝরে গেছে জীবন-তরু থেকে। চলতে গেলে মচমচ শব্দ হয়! জীবনসঙ্গিনী না ফিরলেই সুখী হতুম। কেউ পরে চলে যাক না। দিন কতক পরেই বাপ বাপ বলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আমার সেই জুতো-জোড়ার মত। পরলেই ফোসকা। ভেসলিন, গ্লিসারিন, তুলো, সব হার মেনে গেল। জুতোয় টক দই, কেরোসিন, স্বভাব আর কিছুতেই নরম হয় না। প্রেমের কোন লক্ষণই নেই। যে জগাই মাধাই, সেই জগাই মাধাই। দেখলেই কলসির কানা ছোঁড়ে। শেষে জুতো-বিশেষজ্ঞরা বললেন, ও মশাই খাঁটি গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই কিছু হবে না। পা গলিয়ে আর পিরিতের দরকার নেই। স্বভাব না যায় মলে। পরম ভট্টারকের জুতো করে তাকে তুলে রাখ। শান্তি পাবে। এক জোড়া চপ্পল কিনে নাও, আর লেংচে লেংচে চলতে হবে না। তোমার দুঃখে আমাদের বুক ফেটে ভেঙে যায় মা। জুতো তাকে তুলে রাখা যায়। বউকে তো আর তুলে রাখা যাবে না, ঠিক নেমে আসবে।

শ্যালক সূর্যবাবু নেমে আসছেন। আমার ধুতির ফুলপাড় কেমন ঝিলিক মারছে! আমার নজর পায়ের দিকে। যাক, জুতো জোড়া পায়েই আছে। শ্যালকের পেছনে পেছনে আমার সহধর্মিণী নামছেন। চলন-বলন দেখে মনে হচ্ছে, বেশ বল পেয়েছেন। এমনিই খুব বলবতী। যখন বলতে শুরু করেন তখন আর সহজে থামানো যায় না। এ তো আর প্রেস ফ্রীডাম নয়, যে অর্ডিনান্স করে চেপে যাবে! এ হল নারী স্বাধীনতা, যার শুরু আছে, শেষ নেই। বাপের দেওয়া বাড়ির লোক পেয়ে আজ একটু বেশি বেশি খরখর করছেন।

গাড়ি থেকে মালপত্তর নামছে তো নামছেই। বাবা! কত কি কিনেছে! সারা দক্ষিণেশ্বরটাই কিনে এনেছে। ক্লিং করে মিটার তুলে গাড়ি চলে গেল। অন্ধকারে এবার তেমন দেখতে পাচ্ছি না। শ্যালকের পায়ে সেই জুতো-জোড়াই তো?

সূর্যবাবু বললে, কি দেখছেন অমন করে! আপনার জুতো আমার পায়ে দারুণ ফিট করেছে। সেম সাইজ। আপনি বাঁ দিকে কেতরে চলেন, আমিও বাঁ দিকে কেতরে চলি। আপনিও প্রেমিক, আমিও প্রেমিক। আপনি ফেঁসেছেন, আমি ফাঁসিনি।

স্ত্রী বললেন, ধরো, ধরো।

কাগজে মোড়া বেশ ভারী একটা কি হাতে এসে গেল। স্পর্শে মনে হচ্ছে কাপ-ডিশ। অনেক স্বামীই তোয়ালে জড়ানো ছেলে ধরে বোকা বোকা মুখে স্ত্রীর পেছন পেছন সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসেন। সামনে বেটার হাফ চলেছেন বুক ফুলিয়ে। বেশ মূল্যবান উপহার দিয়ে লোক যেভাবে বিয়েবাড়িতে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে যান। ইনিও সেইভাবেই চলেছেন। আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতুম, আমাকেও নিদারুণ বুদ্ধুর মত দেখাচ্ছে। মন কেবলই উসখুস করছে, কখন জুতো-জোড়া খুলবে, আমি অমনি তাক বুঝে নোট ক'খানা বের করে নোব! পায়ের চাপে ভেপ্‌সে কি অবস্থা হয়েছে কে জানে!

খাবার টেবিলের ওপর একে একে কেনা জিনিস সাজাতে সাজাতে আমার শ্যালকের বোন বললেন, আজ একেবারে প্রাণ খুলে কিনেছি। তোমার সঙ্গে বেরলে কেনাকাটা করে তেমন সুখ হয় না। যা কিনতে যাব তুমি অমনি বলবে, উঁহু উঁহু, বাজে খরচ। এই দেখ কেমন কাপ-ডিশ কিনেছি। পাথরের চাকি-বেলন। আঃ লুচি বেলেও সুখ। আজই উদ্বোধন হবে। এই নাও তোমার অ্যাশট্রে। আর এখানে সেখানে ছাই ফেলবে না। বুদ্ধমূর্তিটা দেখ, আহা তুমি যদি ওই রকম শান্তশিষ্ট, ধ্যানস্থ হতে! সংসারের চেহারাই পালটে যেত। অমন গুলিখোরের মত মেজাজ করেছ কেন? বাইরে মনে হয় তোমার কোন মেয়েছেলে আছে!

হ্যাঁ, এক মেয়েছেলেতেই চক্ষু চড়কগাছ!

আমার মত মেয়ে তুমি পাবে না গো! পড়তে অন্যের পাল্লায়,

হৃদয়ে হাফসোল লাগাতে হত। এই দেখ, দু ডজন চুড়ি কিনেছি, শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে। এবার যখন তোমার সঙ্গে সেজেগুজে বেরব না, তখন দেখবে, চড়চড় করে সকলের বুক ফাটবে। ফিস ফিস করে বলবে, দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

আমি বাঁদর!

মানুষের মত তো কিছুই দেখি না, সব সময় দাঁত খিঁচোচ্ছ।

স্বামীকে বাঁদর বললে কি হয় জান?

নরকে যেতে হয়। তোমার সঙ্গে সংসার করার চেয়ে নরকে গিয়েও সুখ। তোমার ড্যাঙোস আর খেতে পারি না। এই নাও তোমার ফুলদানি আর ধূপদানি। নাও হাত পাত। ভক্তিভরে মায়ের প্রসাদ খাও, মনে মনে বলো, মা আমার স্বভাবটা একটু ভাল করে দাও মা। বলো, আমি যেন একটা মানুষ হতে পারি। অমানুষ করে রেখেছ মা!

হাতের তালুতে গোল মত একটা প্যাঁড়া বসিয়ে দিয়ে, তিনি হুটপাট করে হেঁশেলে গিয়ে ঢুকলেন। আমার নয়, শ্যালকের বড় খিদে পেয়েছে।

শ্যালক সূর্যকান্তের জামা-কাপড় জুতো ছাড়ার তেমন কোনও ইচ্ছেই দেখা যাচ্ছে না। এলিয়ে বসে আছেন সোফায়। বড় ক্লান্ত। মনটা বড় ছটফট করছে। জামা কাপড় না ছাড়ুক, জুতোটা অন্তত খোল! তোমার পদতলে আমার অর্থ দলিত হচ্ছে।

সূর্য, জামা-কাপড় ছেড়ে, পাজামা পরে মুখে হাতে জল দিয়ে বেশ ফ্রেশ হয়ে বোসো না। ভাল লাগবে। সূর্যকান্ত ডান থেকে বাঁ পাশে এলিয়ে পড়ে বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না জামাই-বাবু। গেলুম ট্যাকসিতে, এলুম ট্যাকসিতে কি আর এমন পরিশ্রম! আপনি ব্যস্ত হবেন না। এ তো আমার নিজের বাড়ির মত।

প্রথম দিনেই তোমার তা হলে বেশ চোট হয়ে গেল! কি বল?

এইভাবেই খেজুরে আলাপে মনটা ঘুরিয়ে রাখি! কখন বাবু উঠবেন, কখন বাবু জুতো ছাড়বেন, বাবুই জানেন। বউয়ের ভাইয়ের হালচালই আলাদা। জামাইয়ের চেয়ে আদর বেশি।

একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁধের ভূত কান ধরে মোচড় মারবে।

সূর্যকান্ত একগাল হেসে বললেন, আমার এক পয়সাও খরচ হয়নি। দিদি কার হাতে পড়েছে, দেখতে হবে তো। যেই টাকা বের করতে যাই, অমনি বলে টাকার গরম তোর বউকে দেখাস।

মনে মনে বললুম, আচ্ছা, তাই নাকি? সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। সারা মাসের সংসার খরচ হাওয়ায় উড়ছে! যত টানাটানি রোজ মাছের বেলায়, একটু এদিক-ওদিক খাওয়ার বেলায়।

হেঁশেল থেকে আদরের সুর ভেসে এল। সূর্য, জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নে। গরম গরম ভাজছি। আমার জন্যে কোনও মধুর নির্দেশ এল না।' আমি তো কাঙালি। খেতে বোস, না হাত ধুয়ে বসে আছি।

দেখতে দেখতে বেশ রাত হয়ে গেল। চারপাশ নিশুতি। বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেল রে দিদি, বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেল, বলতে বলতে, সূর্যকান্ত বেশ পরিতৃপ্ত বাঘের মত গোটা কতক হাই তুলে ফুলতোলা চাদরে লটকে পড়ল। বোন এলেন মশারি গুঁজতে। আমার ওপর হুকুম হল, ঘরের মশারিটা ফেলে ভাল করে গোঁজো, হাঁ করে বসে আছ কেন? দেখছ তো, আমি একটা কাজ করছি!

যো হুকুম! আমি তো আর তোমার শ্যালক নই!

দালানে ঘুটঘুট করে ঘড়ি চলছে। বাইরে সূর্যকান্তর নাক ডাকছে। আমার পাশে তার বোন যেভাবে এলিয়ে আছে, মনে হচ্ছে জেগে নেই। এই তো সুযোগ। এই তো চোরেদের বেরবার সময়। যাই, নিজের টাকা নিজেই চুরি করে আনি।

ডান পাটির শুকতলা তুলে ফেললুম। ফাঁকা। তবে কি বাঁ পাটিতে। সে পাটিতেও বিধবার হাহাকার। যাঃ, টাকা নেই। মহারাজ, হাঁড়ি খুলে দেখি মাংস নেই। মাঝরাতে পা ছড়িয়ে বসে আছি, সামনে দুপাটি নিউকাট। পেছন থেকে কাঁধের ওপর দুটো হাত এসে পড়ল। কে রে বাবা ভূত নাকি!

না, আমার সহধর্মিণী।

কি গো, মাঝরাতেই জুতো পালিশ করতে বসলে কেন?

ঘুম আসছে না। তাই ভাবলুম কাজটা একটু এগিয়ে রাখি।'

সকালে তো একেবারেই সময় পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে, যেতে আসতে সূর্য তো এই জুতোটাই পরবে। বলছিল, পায়ে বেশ ফিট করেছে।

দেখেছ, প্রসাদের কি গুণ! তুমি কি ভাল হয়ে গেছ গো, শোনো বৃথাই খুঁজছ, মাল আর ওখানে নেই। কাপ, ডিশ, অ্যাশট্রে চুরি হয়ে গেছে। এপিঠ ওপিঠ দু'পিঠ ট্যাকসি ভাড়া হয়েছে। গোটা পঁচিশ পড়ে আছে। কুড়ি টাকা আমার ধার শোধ। পাঁচ টাকা কাল সকালে তোমাকে দিয়ে দোব। জুতোর তলায় কেউ টাকা রাখে! ছিঃ! মা লক্ষ্মী। জুতোর তলায় চোরা চালান-কারীরা সোনার বিস্কুট রাখে। চলো শোবে চলো। ঝাড়তে গিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম।

তুমি জুতো ঝাড়তে গিয়ে, সারা মাসের হাত খরচ ঝেড়ে দিলে! আমার মাস চলবে কি করে?

ও তুমি ভেব না, যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামণি।

সূর্যর নাক গাঁক করে ডেকে উঠল।

আমি অদৃশ্য কাত্যায়নের দিকে কবজি তুলে ধরে মনে মনে বললুম, কাত্যায়ন, নাড়িটা একবার দেখ তো, বেঁচে আছি না মরে গেছি!

প্রেসার কুকার

আগেকার দিনে নীলকর সাহেবরা বেগার ধরতে বেরোতেন। সাহেব চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। হঠাৎ নজরে পড়ল এক পুরোহিত চলেছেন নামাবলি গায়ে। হাতে শালগ্রাম শিলা। রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি ঘোড়া দাঁড় করিয়ে সাহেব বললে, 'পালাইতেছ কোথা, বেগার ডিটে হইবে।' ব্যস, হয়ে গেল। যজমানের বাড়ি পড়ে রইল দু' ক্রোশ দূরে। সত্যনারায়ণ মাথায় উঠল। পুরোহিত চললেন, সাহেবের নীল চাষে বেগার খাটতে। না গেলেই সপাসপ চাবুক।

যুগ অনেক দূর সরে এলেও আমার সংসার চলছে বেগার প্রথায়। আমার স্ত্রী বেশ ভাল কায়দা বের করেছে। মহিলার ক্ষমতা আছে। পূর্ব জন্মে হয় নীলকর সাহেব ছিল, না হয় সাহেবের হারেমের কোনও দেশি বিবি।

আমি একটা গ্রাম-গ্রাম অঞ্চলে থাকি। বাড়ির চারপাশে একটা বাগান-মত ব্যাপার আছে। প্রথম দিকে বাগানই ছিল। প্রতিবেশী-দের সহৃদয় উৎপাতে সাধের বাগানে এখন নৈরাজ্য চলেছে। কিছু ফুলের গাছ স্ট্যামিনার জোরে এখনও টিঁকে আছে। ক'দিন থাকবে বলা শক্ত। বহুকাল নতুন কোনও গাছ বসানো হয়নি। এখন পাখিরাই বাগান করছে! ঠোঁটে করে বীজ এনে ফেলে।

অনেক সময় পক্ষীকৃত্যের সঙ্গে দু'চারটে বদহজমের মাল বেরিয়ে আসে। জমির স্বাভাবিক ধর্মে দু' একটি স্বাভাবিক গাছ গজিয়ে ওঠে। ওইভাবে বেশ ঝাঁকড়া একটি ফলসা গাছ হয়েছে। মোরগ ফুল হয়েছে। একটা জাম গাছ হয়েছে। জাম মনে হয় পাখিতে করেনি। কোনও লিভারঅলা কুকুরেও করতে পারে, অথবা হনুমানে।

সে যাই হোক। এবার মহিলার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। কারণ, এই কাহিনীর তিনিই হলেন নায়িকা। এককথায় বলা চলে, একটু চেষ্টা করলে তিনি নির্বাচনে জিতে সহজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। আর হলে, আমাদের দেশের হাসপাতালে এই অব্যবস্থা চলতে পারত না। চাবকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। দেশের দুর্ভাগ্য, এমন একটি প্রতিভা গৃহকূপে ছাই চাপা হয়ে আছে।

চেহারায় বেশ একটা কম্যাণ্ডার কম্যাণ্ডার ভাব আছে। হিটলার বেঁচে থাকলে ধরে নিয়ে গিয়ে মহিলা গেস্টাপো করে রাইনল্যাণ্ডে ছেড়ে দিতেন। এঁর সমস্ত কথাবার্তাই যেন মিলিটারি কম্যাণ্ডের মত। অ্যায় বললে জগৎ থমকে দাঁড়ায়। দেয়ালঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়, এ আমার নিজের দেখা। টুলে উঠে পেণ্ডুলাম ঠেলতে হয়। রেডিওর গান থেমে যায়। শিল্পী বলে ওঠেন একটু আস্তে ম্যাডাম। আমি স্পষ্ট শুনেছি। প্রথম দিকে আমার সঙ্গে মাঝরাতে যখন দু'চারটে প্রেমের কথা হত, পরের দিন সকালে প্রতিবেশীরা আমাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতেন। কেন হাসছেন, বুঝতে পারতুম না। একদিন পাশের বাড়ির রসিক বউদি বললেন, কি ঠাকুরপো, কাল লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাটলেট খাওয়া হয়েছিল?

কি করে বুঝলেন?

রাত আড়াইটের সময় ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম, আপনার স্ত্রী বলছেন, সরে শোও, তোমার মুখে ভক ভক করছে পেঁয়াজের গন্ধ। এবার থেকে বাইরে কিছু খেলে, একটা করে বড় এলাচ খাবেন। পেঁয়াজের মুখে হাম খেলে প্রেম কেঁচে যায়। জর্দা দিয়ে পানও খেতে পারেন। প্রেমিকারা প্রাণের দায়ে সহ্য করলেও, স্ত্রীদের করা উচিত নয়।

সেই দিন বুঝেছিলুম, জীবনের অনেক কথাই গলার গুণে লিক করে বসে আছে। একদিন মাঝরাতে ভীষণ মেঘ করে ঝোড়ো বাতাস বইছিল। 'উঠো-উঠো, ঝড় উঠেছে,' বলে কম্বুকণ্ঠে এমন একটি হাঁক ছাড়লেন, যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজাচ্ছেন। সারা জনপদ জেগে উঠে চিৎকার করতে লাগল, কি হয়েছে, কি হয়েছে? 'জানালা বন্ধ করে পাখাটা খুলে দাও,' বলে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

এ সবই তাঁর চরিত্রের গুণ। ঈশ্বর বেশ বড়সড় কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন, প্রোডাকসন লাইন থেকে মাল হাত ফসকে মহিলা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাড়িতে একবার চোর পড়েছিল। চোরের আর দোষ কি। অসময়ে বাড়ি বাড়ি ঢোকাই তার ব্যবসা।

চোর দিয়েই শুরু করা যাক।

চোরদের নিয়ম হল, চুরি করার আগে বাড়ি চৌহদ্দিতে একটু বড় বাইরে করা। ঠিকমত হলে বুঝতে হবে নার্ভ ঠিক আছে। এইবার পাইপ বেয়ে ওঠো, কি তালা ভাঙো অথবা গ্রিল ওপড়াও। হাত-পা কাঁপবে না, দিল হেলবে না। নিজের ওপর নিজের কনট্রোল।

আমার স্বভাব হল জেগে আছি তো বেশ আছি। একবার শুয়ে পড়লে মড়া। তখন জাগাতে হলে ঢাক-ঢোল বাজাতে হবে। কিংবা ঠ্যাং ধরে খাট থেকে ফেলে দিতে হবে। কখন চোর ঢুকেছে জানি না। কিভাবে ঢুকেছে তাও জানি না। শুনেছি খোলা জানালা দিয়ে চোরেরা প্রথম গাঁজাপক্ক বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। তাতে গেরস্থর ঘুম বেশ পেকে ওঠে। তার মানে আমার পাকা ঘুম আরও পাকা হয়েছিল।

আমার যখন ঘুম ভাঙল, চোর তখন মহিলার খপ্পরে। আমাদের একটা বাঘা কুকুর আছে। তার হাঁকডাকও পালিকার কনট্রোলে। যখন ডাকের দরকার নেই, তখন তাকে ঘুমের বড়ি খাওয়ানো হয়। বাঘা তখন হাত-পা ছড়িয়ে ভোঁস ভোঁস ঘুমোয়। নেশা কেটে গেলে ওঠে, উঠে ভুক্ ভুক্ ডাক ছাড়ে। তখন তার জন্যে বিস্কুট আসে, দুধ আসে। তার খাতিরই আলাদা। সংসারে তার যত্ন আমার চেয়েও বেশি। হিংসে হয়। হলে কি করব। সে কুকুর। পেয়ারের

কুকুর। আমি মানুষ। হতচ্ছেদ্দার স্বামী। না মরলে আমার কদর হবে না। মরে যেদিন ছবি হয়ে ঝুলব, সেইদিনই হয়তো প্রাপ্য সম্মান পাব। দু ফোঁটা অশ্রুজল। তখন আমি গাইব, জীবনে যারে তুমি দাওনি চা-বিস্কুট, মরণে কেন তারে দিতে এলে মশামারা ধূপ। শুনতে পাবে না। না শোনাই ভাল। শুনলেই তেড়েফুঁড়ে উঠবে, কি বললে? ভুলেই যাবে, আমি মরে ভূত হয়েছি।

না, অন্য প্রসঙ্গে সরে যাচ্ছি। এসব হল পুরুষ মানুষের অভিমানের কথা। পুরুষ বললে প্রতিবাদের ঝড় বইবে। এ হল খোকা-পুরুষ। কুকুরের কথায় ফিরে আসা যাক। কুকুর এমন ট্রেনিং পেয়েছে, আমাকেও ধমকায়। মহিলার ওপর হয়তো একটু হম্বিতম্বি করে ফেলেছি, কুকুর অমনি প্রতিপক্ষের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে গরর্ গরর্ করে জানান দিলে, বেশি বাড়াবাড়ি করেছ কি, খ্যাঁক। আধপো মাংস নিয়ে নেমে যাব। সেই সময় স্ত্রী যদি আমার মাথার পেছনে সোহাগের হাত না রাখে, সারাদিন আমাকে এক জায়গায় স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া করলেই কুকুর গরগর করবে। আচ্ছা দাওয়াই পাকড়েছে যা হোক। দাম্পত্য কলহের পরিণতি, আমার করুণ মিনতি, ওগো আর করব না, এই নজরবন্দী অবস্থা থেকে আমাকে মুক্ত কর মা এলোকেশী, ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার নানারকম ব্যবস্থা ছিল। কুকুরের ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা খুব সহজ। নাকের কালো অংশে একটু কাঁচা লঙ্কার রস। সেই পদ্ধতিতেই কুকুরকে জাগানো হয়েছে। চোর ঢুকেছিল খাবার ঘরে। বাসনকোসনের লোভে। বাইরে থেকে শেকল তুলে তাকে বন্দী করা হয়েছে। জানালা দিয়ে কথা-বার্তা চলছে। মহিলা হাতে একটা খেটে লাঠি নিয়ে জানালার বাইরে। চোর ঘরের মেঝেতে উবু। বাঘা সামনের দুটো পা জানালার গ্রিলে তুলে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। এবার কি হবে বাছাধন! চোর আমাদের পরিচিত। তার নাম সোনা। সোনার-চাঁদ ছেলে। সকালে খুব টেরি বাগিয়ে ঘোরে।

সেই চোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নাকখত দিতে দিতে।

কোমরে দড়ি বাঁধা হল। এমন বুদ্ধি আমার মাথায় আসত না। মহিলা বললেন, বল কোথায় কি করেছিস ?

কেঁদে বললে, পাতকোতলায়।

সেই মাল নিজে হাতে তুলে পরিষ্কার করতে হল। তারপর ঝাঁ্যাটা আর ফিনাইল। ভোর হয়ে এল। নিষ্কৃতি পাওয়া অত সহজ নয়। বেলা বারোটা অবধি চোর বাঁধা রইল বারান্দার থামে, বাঘার পাহারায়। জনে জনে আসে আর দ্যাখে। ওমা! এ যে আমাদের সোনা !

মহিলা সোনাকে একটি সাইকেল রিকশা কিনে দিয়েছেন। সোনা এখন রিকশা চালায়। রোজ তিন টাকা জমা দিয়ে যায়। আর মালকানকে হিঁয়া হুঁয়া ঘোরায়। সে বেচারা চোর থেকে সাধু হয়ে বেগার খেটে মরে। বেলা দেড়টার সময় কটকটে রোদে লাইন দিয়ে ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে এনে মহিলা দারোগাকে সন্তুষ্ট রাখে। যিনি সোনার মত পাকা চোরকে কলুর বলদের মত নাকে দাড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারেন, তাঁর যে অসীম ক্ষমতা এ-কথা রাষ্ট্রপতি মানবেন।

একবার হাত খুলে গেলে তাকে আর পায় কে !

ফুলগাছের কিছু অংশ পাঁচিলের বাইরে যাবেই। রাজা ক্যানিউটও শাসনে রাখতে পারবেন না। ভোরের দিকে সাজি হাতে বাচ্চা একটি মেয়ে, সবে একটা ডাল ধরে টান মেরেছে, মালকান পাঁচিলের এপাশ থেকে আদুরে গলায় বললেন, কি রে, ফুল নিবি বুঝি ?

আদরে গলে গিয়ে মেয়েটি বললে, হ্যাঁ মাসিমা।

আয় ভেতরে আয়।

আমি ভাবছি, বাবা, শরীরে বাতের মত হঠাৎ এমন দয়া হলো কোথা থেকে। গাঁটে গাঁটে দয়া। মুখে টুথব্রাশ। সাণ্টাক্লজের গোঁফের মত চারপাশে পেস্টের ফেনা ! মেয়েটি হাসিমুখে ভেতরে এসে দাঁড়াল। ফুল চুরি করতে গিয়ে এমন অভ্যর্থনা সে কোথাও পায়নি।

দে, সাজিটা দে। মহিলা বাঁ হাতে সাজিটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন এক কুলো রেশনের চাল নিয়ে।

আয়, এই রকে বোস।

মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, বোসবো কেন মাসিমা ? আপনি যে বললেন, ফুল দেবেন, চাল দিচ্ছেন কেন ?

চাল দোবো কেন ? চাল ক'টা এখানে বসে বেছে দে। তারপর ফুল পাবি।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, আমার ফুল চাই না মাসিমা। সাজিটা ফেরত দিন।

মাসিমা উত্তরে চ্যাপ, বলে অ্যায়সা এক ধমক দিলেন। বোস এখানে, চাল বাছ, তবে সাজি পাবি।

বেচারার কি গেরো। খোল নলচে দুই-ই গেল। করুণ মুখ দেখে আমি একটু সালিশি করতে গিয়ে এক ধমক খেলুম, তুমি চুপ করো। তোমার চরকায় তেল দাও, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ মিহি সুরে বললেন, কতক্ষণ আর লাগবে, টুকটুক করে বেছে ফেল, এক সাজি ফুল পাবি।

ঘণ্টাখানেক লাগল সেই চাল বাছতে। তারপর হুকুম হল, নে, সব গাছে উঠে এক সাজি ফুল পাড়। সেই ফুল তিন ভাগ কর। এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোর, আর এক ভাগ কালীবাড়িতে দিয়ে আসবি।

কালীবাড়ি যে অনেক দূরে মাসিমা। দেরি হয়ে যাবে। আমার মা বকবে !

চুউপ। একটা কথা নয়। যা বলছি তাই শুনবি। তা না হলে সাজি কেড়ে রেখে দোব, কুকুর লেলিয়ে দোব। পাঁচিলের বাইরে লকলক করে দুলছে ফুলগাছের ডাল। বড়োই লোভনীয়। তবে হাত দিয়েছ কি মরেছ। এক-একটি অক্টোপাশের শুঁড়। ভোরের বাগানে অক্টোপাশ চটি পায়ে ঘুরছেন। মুখে টুথব্রাশ। ডাল ধরে কেউ না কেউ টানবেই আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যাবে সেপটোপাসের জালে। বাছো এক কুলো চাল, তবেই মিলবে এক মুঠো ফুল, নয়তো সাজিটাও যাবে।

আমাদের বাড়িতে তিন-চারটে জলের কল। একটা কল কুয়োতলায়, সেখানে দুটো চৌবাচ্চা। একটা বিরাট আর একটা মাঝারি। লোডশেডিং-এর পর প্রথম যে জল আসে সেটা টালার

মিষ্টি জল। মিনিট পনের থাকে। তারপরেই আসে ডিপটিউব-ওয়েলের কষা জল। এই মিষ্টি জল নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বালতি, ডেকচি, গামলি নিয়ে যত কুঁচো-কাঁচা ঢুকে পড়ে বাড়িতে।

এই জল হল বেগার ধরার ফাঁদ। দৃশ্যটি বড়োই মনোরম। ফাঁদে এক সঙ্গে এত শিকার? মাকড়সার প্রাণ নেচে ওঠে। খেল শুরু হয় বালতি ভরে ওঠার পর। জল-টলটলে বালতিটি তুলে নিয়ে সরে পড়ার তালে ছিল একটি কিশোর। ঘাড়ে যেন বাঘ পড়ল।

জগো, বালতি রাখ। চৌবাচ্চা দুটোর ফুটো খুলে সব জল বের করে দে।

জগো ভাবলে, বাঃ, এ বেশ খেলা! কলকল জল বেরুচ্ছে। চৌবাচ্চা খালি হচ্ছে। জানা ছিল না ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে। এই এতখানি একটা বুরুশ হাতে মালকান এসে সামনে দাঁড়ালেন, কোমর বেঁধে, নে, এইবার ঘসে ঘসে ভেতরের শ্যাওলা পরিষ্কার কর।

জগোর চক্ষু চড়কগাছ, ও ঠাম্মা, এ আমি পারব না।

তোর ঘাড় পারবে। জল নেবার সময় মনে থাকে না। পরিষ্কার করলে তবেই জলের বালতি নিয়ে যেতে দোব।

এক ঘণ্টা লাগল জগোর চৌবাচ্চা সাফ করতে। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। হুকুম হল, ভাল করে ফুটো বন্ধ করে পাইপ লাগা। চৌবাচ্চায় পাইপ লাগাবে কি, ঘসে ঘসে জগোর নড়া ছিঁড়ে গেছে। তার নাকে অক্সিজেনের নল গুঁজতে পারলে ভাল হয়। জগোর সঙ্গে জল নিতে এসে ফাঁদে পড়েছে উমা। সে আর একপাশে চিঁচিঁ করছে। বাজার থেকে চুনো মাছ এনে-ছিলুম। বঁটি, ছাই আর চুনো মাছ নিয়ে সে বসে আছে ছলছল চোখে। ওই মাছ শেষ করে উঠলে তবে সে জলের গামলা তুলে নেবার ছাড়পত্র পাবে।

সামনের রাস্তা দিয়ে সনাতন চলেছে নেচে নেচে। এই শোন, কোথায় যাচ্ছিস?

পাশের একটা ছোট কারখানায় সনাতন কাজ করে। কারখানার কি একটা কিনতে বাজারে ছুটছিল। হাতে লোহালক্কড়। ছেলেটা

সব সময় হাসে। হাসতে হাসতে পাঁচিলের পাশে এসে বললে, বাজার যাচ্ছ মাসিমা।

তোর ওই লোহালক্কড় রাখ এখানে।

কেন মাসিমা?

এই নে কেরোসিনের টিন আর টাকা। ওদের দোকানে তেল দিচ্ছে। এনে দে পাঁচ লিটার।

আমি কারখানার কাজে যাচ্ছি যে।

গোলি মার তোর কাজে। এক ফোঁটা তেল নেই বাড়িতে। আমরা কি অন্ধকারে থাকব!

বিরাট লাইন মাসিমা। আমি পরে এনে দোব।

হ্যাঁ তেল তোমার জন্যে বসে থাকবে।

এখন আমি পারব না।

ঠিক আছে মনে থাকে যেন। আজ বাদ কাল শনিবার, তুমি টি.ভি দেখতে এসো। সরস্বতী পুজোর সময় লাইটের কানেকশান চেয়ো, তখন ভাল করে দোব।

কুইনিন খাবার মত মুখ করে সনাতন ছুটলো তেল আনতে।

ইতিমধ্যে গৌর পালাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সেও ফাঁদে পড়ে গেল। তার ঘাড়ে চাপল রেশন। গুঁইগাঁই করছিল। যেই শুনলে, আমাদের ছেড়ে দেওয়া পামতেল ভবিষ্যতে আর পাবে না, ঘাড় হেঁট করে ছুটল রেশন তুলতে। মাঝে মাঝে আমরা চাল গম আর তেল ছেড়ে দি। গৌরের মা সেই সব পায়। গৌরের টিকি তাই মহিলার হাতে। টানলেই মাথা চলে আসে।

দাদারও দাদা আছে। এমন চেলা আছে যে গুরুকে চা বাগানে বেচে দিয়ে আসতে পারে। ক'দিন থেকেই লক্ষ করছি মহিলার দাপট যেন একটু কমে এসেছে। সামান্য উদাস উদাস ভাব। মাঝে মাঝেই পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। গলা তুলে তুলে কাকে যেন খুঁজছেন। যৌবন উতরে গেল, এ বয়েস তো প্রেমে পড়ার নয়। বলা যায় না, পরকিয়া কখন কিভাবে এসে পড়ে! যদি আসে মন্দ হয় না। কেউ ইলোপ করে নিয়ে চলে যায়, দিনকতক একটু শান্তিতে থাকা যায়।

পাঁচিলের কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন, মুখে চুকচুক শব্দ। একেবারে আমার মুখোমুখি।

কি হল ম্যাডাম?

থাক আর রসিকতা করতে হবে না। আমার বলে নিজের ঘায়ে কুকুর-পাগল অবস্থা!

কেন, কী হল?

সনাতনকে ক'দিন হল দেখতে পাচ্ছি না।

তেল ফুরিয়েছে বুঝি?

তেল ফুরোলে তো বুঝতুম, আমাদের প্রেসার কুকারটা সারিয়ে আনতে বলেছিলুম! সে যে নিয়ে গেল, আজ সাতদিন হয়ে গেল টিকির দেখা নেই। এদিকে একটা গুজব শুনছি, সত্যি-মিথ্যে জানি না।

কি গুজব? ছেলেধরার!

আরে ধুর, ও দামড়াকে কে ধরবে! শুনছি, ওই নাকি একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে পালিয়েছে।

সে কি গো, একটা প্রেসার কুকারের যে এখন অনেক দাম!

তাই তো রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। তুমিও একটু সন্ধান করো না। ধরতে পারলে বাপের নাম ভুলিয়ে দোব।

এ পাড়ার দুজন মানুষ এখন হন্যে হয়ে দুটো জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছেন। একজন তালাশ করছেন তাঁর একমাত্র মেয়ের। আর একজন সন্ধান করছেন প্রেসার কুকারের। সংসার বড়ো মিইয়ে পড়েছে। জোড়া হিস্ না হলে তেমন জমে না। প্রেসারেরও মেল-ফিমেল আছে। মেলটা গেছে, ফিমেল তাই বড়ো মন-মরা। এই বিরহে আমি কিন্তু বড়ো মধুর আছি!

পয়সা

হঠাৎ আমার প্রচুর পয়সা হল। কী করে হল তা বলব না। তবে হল। পয়সা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারাও পাল্টে গেছে। সামনের চুল পাতলা হয়ে টাক বেরিয়েছে। সামনে ভুঁড়ি নেমেছে। দু' চোখের কোলে দুটো ব্যাগ তৈরি হয়েছে। মেজাজটাও ইদানীং বেশ চড়েছে। পয়সা হলে যা হয় আর কি!

বড়লোকদের চালচলন কেমন হয় আমার জানা নেই। বিনয়ী বড়লোক আমি দেখেছি। এঁরা হলেন সাতপুরুষ বড়লোক। ভিটেয় ঘুঘু চরলেও লোকে পুরনো আমলের বড়লোক বলে খাতির করে। তার মানে, কবে ঘি খেয়েছেন, সেই গন্ধ এখনও হাতে লেগে আছে। আমি একপুরুষে হঠাৎ বড়লোক। আমার কী হওয়া উচিত জানা নেই। তবে শুনেছি বড়লোকেরা বিকেলের দিকে গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। হাতে ছড়ি। সোজা পা ফেলে দ্রুত বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। হজমশক্তিও বাড়ে, তাছাড়া সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। কি বুঝতে পারে! খাবার জিনিস প্রচুর, হজমশক্তি একটু কম। হাঁটার ধরন দেখে বুঝতে পারবে, শরীরে শক্তি রাখে, দৃপ্ত ভঙ্গি। কারণ অপুষ্টিতে ভোগে না, কারণ পয়সাওলা। পয়সাই জগৎ। আমি তাই জগৎপিতা।

ড্রাইভার গাড়ি থামাও।

স্ট্যাণ্ডের বাঁ পাশে ময়দান ঘেঁসে গাড়ি দাঁড়াল। বাঃ, চমৎকার বিকেল। পশ্চিমে সূর্য নেমে পড়েছে। আকাশ লালে লাল।

অজয়, চমৎকার বিকেল, কী বল ? অজয় আমার ড্রাইভার !

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ না, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। কবে তোমার অভ্যাস হবে !

হয়ে যাবে স্যার। আগে যাঁদের ড্রাইভার ছিলুম তাঁদের তো স্যার বলতে হত না। লাস্ট যাঁর গাড়ি চালাতুম তাঁকে বলতুম দামুদা।

দামুদা ! যাচ্ছেতাই নাম।

নামে কী আসে যায় স্যার ! পয়সা তো আর নাম দেখে আসে না।

ছেলেটা যেন দার্শনিক ! বয়েস কম হলে কী হবে, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। সত্যিই তো নামে কী যায় আসে। এই তো আমার নাম পাঁচুসুন্দর। অজয়ের চেয়ে অনেক বিশ্রী নাম। অথচ গাড়ির মালিক আমি, চালায় অজয়।

আমার নিয়ম হল, প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে থাকা। চারপাশে তাকিয়ে দেখা। তারপর দরজা খুলে নেমে, গঙ্গার ধারের বাঁধানো রাস্তায় পায়চারি। যতক্ষণ গাড়ি থেকে না নামছি ততক্ষণ অজয়ের সঙ্গে বকর বকর করি। বড়লোকদের চালচলন অজয় জানে ভালো। আমি তো সদ্য বড়লোক। টাকাটাই হয়েছে, বড়লোকি চালচলন এখনও শেখার অনেক বাকি। অজয়ের সঙ্গে তাই মাঝে মধ্যে কথা হয়। এই কথার সময় অজয় আর আমার গাড়ির ড্রাইভার নয় আমারও ড্রাইভার। আমার শিক্ষক।

কাঁচা বয়েসের মেয়েরা কাঁচা বয়েসের ছেলেদের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আইসক্রিম চলছে, ফুচকা চলছে, ভেলপুরি চলছে, কোলড্ ড্রিংকস চলছে।

অজয়, কে যেন বলেছিল, কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়ছে ?

আজ্ঞে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা।

সে আবার কে ? অজয়কে কখনও ঠকানো যায় না। যা জিজ্ঞেস করব, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক বলা শক্ত। চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে দিতে অজয় পৃথিবীর প্রায় সব কিছু জেনে ফেলেছে। বরাতে চাকরি অবশ্য জুটল না। শেষে ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভারি।

মেয়ে দেখছিলুম, মিথ্যে বলব না, মেয়েই দেখছিলুম। পয়সা যখন ছিল না তখন হাঁ করে আকাশ, পাখি, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য

অনেক দেখেছি। এখন পয়সার সঙ্গে সঙ্গে দুটো 'ম' যেন হামা-গুড়ি দিয়ে মনে আসতে চাইছে। আহা, যেন দুটি বালগোপাল, হামা দিতে দিতে আসছে। হাতে নাড়ু।

বুঝলে অজয়, মাঝে মাঝে মনে হয় অ্যারিস্টটল ওনাসিস হয়ে যাই। জীবনটাকে একটু ভোগ করে দেখি।

দেখুন না স্যার! ক্ষতি কী?

ওনাসিসের নাম শুনেছ?

খুব শুনেছি স্যার। জ্যাকলিন কেনেডি যাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

তুমি দেখছি সব জানো? কী বল?

কী বলব স্যার?

আমার সেকেলে বউটাকে বাতিল করতে হবে। ঠিক যেন বড়াই বুড়ি।

বাতিল করবেন কেন? বউদি তো ঘরে থাকবেন। আপনি ফুর্তি করবেন বাইরে। টাকা দিয়ে তো আর স্নেহ-ভালবাসা কিনতে পারবেন না। স্নেহ ভালবাসা সেকেলে জিনিস, ওসব সাবেককালের মহিলারাই দিতে জানেন।

ও কথা কেন বলছ? ওই তো সব জোড়ায় জোড়ায় কেমন ঘুরছে লাল লাল ঠোঁটে আইসক্রিম চুষছে।

হ্যাঁ চুষছে। ওকে চোষাই বলে। এরপর কাঠিটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। আজ প্রশান্তদাকে, কাল অসীমদাকে। ওর মধ্যে ক'টা বউ ঘরে ওঠে দেখুন! ঘুরতে ঘুরতে যৌবন একদিন চলে যাবে। মেক-আপের যৌবন আরও কিছুদিন চলবে, তারপর ভোঁ ভোঁ।

মেয়েদের ওপর তোমার দেখছি ভীষণ রাগ। কারণটা কী?

আজ্ঞে, এ বাজারে চাকরি আর বউ দুটোই পাওয়া যায় না।

যদ্দিন টাকা ওড়াতে পারবেন, তদ্দিন পরীরা উড়ে উড়ে আসবে। যেই আপনার ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে যাবে অমনি সব হাওয়া।

নাঃ, এইবার একটু বাইরে বেরিয়ে হাওয়া খাওয়া যাক? অনেক জ্ঞানের কথা শোনা গেল।

আচ্ছা অজয়, তুমি কখনও রেস খেলেছ?

আজ্ঞে না। তবে রেসের মাঠে গেছি। বাইরে থেকে দেখেছি, ঘোড়া ছুটছে। এই সময় রেস হয়?

হ্যাঁ, এখন মনসুন রেস।

নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। একপাশে নরম ঘাস, অন্যপাশে পিচের রাস্তা। দূরে গঙ্গা, জাহাজ ভাসছে। মাস্তুলে দেশ-বিদেশের পতাকা। পয়সা হবার পর থেকেই লক্ষ করছি, মনটা মাঝে মাঝেই কেমন যেন ভাবুক ভাবুক হয়ে যায়। এতকাল ছিল অন্ন চিন্তা। চমৎকার সেই চিন্তা থেকে মন যেই সরে এসেছে, হয়ে গেছে উদাসীবাবা। ভোগের বয়েসে ভোগ হল না, এই বয়েসে আর কী হবে। এই তো মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, চুল ফিরিয়ে মেজাজে ঘুরছি, কেউ তাকাচ্ছে আমার দিকে? কেউ না। ওই তো সিল্কের শাড়ি পরে নধর একটি মেয়ে চোয়াড়ে একটি ছেলের বগলদাবা হয়ে আসছে। নিজেদের ভাবেই মশগুল। যৌবন যৌবনকেই চায়, প্রৌঢ়ে আর কদর কি!

এখন মেয়েছেলে চাইলে মুখ নিচু করে সেই পাড়ায় যেতে হবে। এখন চরিত্রহীন না হলে ভোগ হবে না। অজয় যত বাজে কথা বলে। কোনদিন বলে বসবে, পয়সা হলে টাকেও চুল গজায়। আসলে ও ব্যাটা একটা চামচা। মন জোগানো কথা বলে।

বেড়াতে বেড়াতে একটা আইসক্রিম স্টলের কাছে এসে পড়েছি। যুবক হলে ঝট করে একটা খাওয়া যেত। এখন খেতে গেলে কেউ হয়তো গ্রাহ্যই করবে না, আমার নিজের মনটাই হেসে উঠবে, বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ! ভয়ও আছে, গলা-খুসখুস কাশি।

আবার ফিরে এলুম নিজের গাড়িতে। অজয় বসে ছিল ঘাসের ওপর। মনটা যেন বিষণ্ন। হবেই তো। ওই বয়সের ছেলে, জীবনে কত সাধ-আহ্লাদ! গাড়ি চালিয়ে সামান্য ক'টাকাই বা পায়! আমাকে দেখে উঠতে যাচ্ছিল, বললুম, বস বস, আমিও তোমার পাশে একটু বসি। ওদিকটায় একা একা তেমন ভাল লাগলো না।

অজয়ের পাশে বসতেই সামনের আকাশটা নিচে নেমে গেল। পিছন দিকে দুটি শিশু দৌড়াদৌড়ি করছে।

আচ্ছা অজয়, তোমাকে যদি এখন একলাখ টাকা কেউ দিয়ে দেয়, তুমি কী করবে?

ব্যাঙ্কে ফিক্সড্‌ ডিপোজিট করে দিয়ে যেমন গাড়ি চালাচ্ছি তেমন চালাব।

সে কী? আর কিছু করবে না? প্রেম ভালবাসা, ফুর্তি?

আজ্ঞে না, এক রাত কা আমির হয়ে পরের দিনই ফকির হয়ে রাস্তায় ঘুরতে চাই না। ওটা তো আমার রোজগার নয়। আমার রোজগারের ক্ষমতায় যেমন আছি তেমন থাকব। ডাল ভাত নুন ভাত, যেমন জোটে জুটবে।

টাকাটা তো ইনভেস্ট করতে পারো, ব্যবসায়, কি বাড়িতে, এক লাখ থেকে দু'লাখ, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার···।

আজ্ঞে না, সে মুরোদ আমার নেই। নিজেকে নিজে যত ভাল করে চিনি অত ভাল করে আর তো কেউ চিনবে না। নিজের দৌড় নিজে জেনে গেছি। বড়লোক হবার জন্যে আমি জন্মাইনি।

আমি তো হয়েছি! আমারও তো এক সময় দিন চলত না!

আপনি বরাতে হয়েছেন, কপালে ছিল।

এ সব মানো?

খুব মানি।

দুই

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে শুনছি গানের সুর ভেসে আসছে। মেয়ের বায়নায় একটা স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার কিনে মহাবিপদ হয়েছে। আমার বিপদ পাড়ার আর পাঁচজনেরও বিপদ। কান ঝালাপালা। একে তো বিশাল এক বাড়ি হাঁকিয়ে অনেকের আলো-বাতাস কেড়ে নিয়েছি।

কেড়ে না নিলে বড়লোক হওয়া যায় না। যতদিন চেয়েছি কিছুই পাইনি।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মনে হল, অজয়টা ভীষণ ভীতু, ম্যাদামারা বাঙালী। বরাত মেনে স্টিয়ারিং ধরেই জীবনটা কাটাতে চায়। মনে মনে অদৃশ্য অজয়কে উপদেশ দিলুম, ওহে যুবক! জীবনে উচ্চাশা না থাকলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমার পায়ের জুতো জোড়া সমঝদারের মত মচমচ শব্দ করছে।

সিঁড়ির ঝকঝকে মসৃণ হাতলে হাত ঘষতে ঘষতে উঠছি। চারদিক ঝলমল করছে। নতুন বাড়ি, নতুন মোজাইক, নতুন ফার্নিচার। পয়সার একটা আলাদা জেল্লা আছে। জেল্লা সহ্য হয়, শব্দটা সহ্য হয় না। যত ওপরে উঠেছি গানের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। ওরে গান থামা! থামা বললেই কি থামবে! আমার পয়সা এদের স্ফূর্তিতে জোয়ার এনেছে।

বাপি! তুমি এসে গেছ!

সামনেই আমার মেয়ে। বেশ বড়সড় হয়েছে। কী একটা পরেছে, আরও যেন বড় দেখাচ্ছে। নাঃ, এবার বিয়ে দিতেই হবে। আর ধরে রাখা যাবে না। এই বয়েসটা বড়ো ভীষণ। ওই গঙ্গার ধারে দেখে এলুম যে একটু আগে। গালে দুটো একটা ব্রণ বেরিয়েছে।

তোমার গাড়িটা নিয়ে আমরা একটু বেরোচ্ছি।

অ্যাঁ, এখন বেরোবি! অজয়কে এখন ছুটি দোব ভেবেছিলুম। ও তো একটা মানুষ। কোথায় যাবি?

আমরা তিন বন্ধু একটু মার্কেটের দিকে যাব।

অজয় রাগ করবে না?

সে আমরা বুঝব।

সমান বয়েস, সমান চেহারার তিনটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মিষ্টি গন্ধ উড়ছে, হাওয়ায় ফুরফুরে চুল উড়ছে। পোশাকের খসখস শব্দ।

আমি উঠছি। ঘুরে ঘুরে ক্রমশই ওপরে উঠছি। ওরা নেমে যাচ্ছে নিচে। দু'পক্ষের দূরত্ব বাড়ছে। বাড়বেই তো। আরও বাড়বে। ওরা এক জগতের আমি এক জগতের।

ঘরে এসে দেখি আমার গৃহিণী জড়ভরতের মত বসে আছে।

কী গো, এই ভাবে বসে?

কী-ই বা করব?

সত্যিই তো, কী আর করবে! কেন, টি. ভি দেখ। গান, ফিল্ম।

দূর, ভাল লাগে না! ও সব আমি তেমন বুঝি না।

তা হলে কিছু খাও।

কত খাব! হজম হয় না।

তা হলে এসো দুজনে ঘুরে ঘুরে নাচি।

সে বয়স আর নেই।

বেশ, তাহলে এসো দুজনে ঝগড়া করি।

কী নিয়ে ঝগড়া করব? কোন অভাবই তো আর নেই! তখন ঝগড়া হত এটা ওটা নিয়ে, এখন কী নিয়ে হবে?

তাও তো বটে। তা হলে এসো কীর্তন করি, সাঁই-ভজন।

ভক্তিও নেই তেমন, গলাও নেই।

তা হলে ঘুমোও, ওভাবে পুঁটলির মত বসে থেক না।

কত ঘুমোব। ঘুম আর আসে না।

সে কী! ঘুমও আসে না?

না। তুমি এবার মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা কর। ওর চালচলন তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না।

যাক, তাহলে ভাববার মত একটা দুশ্চিন্তা পাওয়া গেছে। আমি অবশ্য সুখের মধ্যে একটা দুঃখ খুঁজে পেয়েছি।

দুঃখ!

হ্যাঁ দুঃখ। একটা ছেলে না থাকার দুঃখ।

আর কী হবে। সময় চলে গেছে।

হ্যাঁ, সময় চলে গেছে। সব চুকে-বুকে গেছে। আগুন নিভে গেছে, পড়ে আছে ছাই। চললে কোথায়?

চা খাবে তো—

হ্যাঁ, চা—চা খেতে হবে। তার জন্যে যেতে হবে কেন?

বলে আসি।

ঠিক ঠিক। বেশ, বলেই চলে এসো। আমি আবার একলা থাকতে পারি না। শেষের সময় তুমি কাছে থাকবে তো!

ও সব অলুক্ষণে কথা ভর সন্ধেবেলা নাই বা বললে!

মনে হল তাই বললুম।

মনে আর আসতে দিও না।

মনকে কে বাঁধবে! বাঃ, বারান্দায় বেশ হাওয়া দিচ্ছে। অনেকটা উঁচুতে উঠেছি। অন্য সব বাড়ির ছাদের মাথা দেখা যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে। আলোর বিন্দু খইয়ের মত ছড়িয়ে আছে। আমার একটাই মাত্র মেয়ে, নাম পদ্মা। অনেক ছেলে-মেয়ে আনা যেত। তখন তো উপায় ছিল। বেহিসাবী হলেও মরতে হত।

পদ্মা কি প্রেম করেছে? ছেলে-টেলে ধরেছে নাকি! কে বলতে পারে? অজয় পারে। ওর সঙ্গেই তো ঘোরে। অজয় আজ আমাকে অবাক করে দিয়েছে। বয়স কম, কিন্তু মনের কী সাঙ্ঘাতিক জোর। এ রকম ছেলে লাখে একটা মেলে। একালের ছেলেদের কোন বদ খেয়ালই ওর মধ্যে নেই।

পদ্মা ফিরে এলো। গুন গুন করে গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে পা ঘষে ঘষে উঠছে। নেশা করেছে নাকি? টলছে মাতালের মতো। মাঝে মাঝে সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরছে দু'হাতে।

পদ্মা!

বাঅবা, তুমি আমার বাঅবা, তাই তো! হ্যাঁগো, তুমিই আমার বাবা?

পদ্মা আমার বুকে মুখ গুঁজে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তুমি জর্জকে কিছু বলতে পারো না বাবা!

জর্জ! সে আবার কে?

একটা ছেলে। আমাকে পেতনী বলেছে। আমি পেতনী!

আমার বুক থেকে মুখ তুলে পদ্মা দু'হাত পিছিয়ে গেল। মুখটা জবাফুলের মত লাল টকটকে। চারপাশে চুল উড়ছে।

তুমি দেখ তো আমি কি পেতনী, সত্যিই আমি পেতনী?

পদ্মা একে একে জামা খুলছে! শার্ট খুলে ফেলেছে। জিন্‌স খোলার জন্যে কাঁপা কাঁপা হাতে ফাস্টনারের মুখ খুঁজছে। একটানে সব খুলে ফেলল। শুধু প্যাণ্টি আর ব্রা পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার একমাত্র মেয়ে পদ্মা। যখন ও এতটুকু শিশু, তখন কোলে করে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। কাঁথা পালটে দিয়েছি। সেই পদ্মা আমার সামনে, আমাকে বিচারকের ভূমিকা নিতে হবে। এ শরীর আমার অচেনা, এর ভেতরে যে মন বাসা বেঁধেছে সে আরও অচেনা। পদ্মা দু'হাত দু' কোমরে রেখে পা দুটোকে ফাঁক করে বললে, কী, কিছু বলছ না কেন বাবা? আমি কি পেতনী! আর রুমকি পেতনী নয়!

কে রুমকি, কে জর্জ! আমার সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে সে-ই বা কে! আমার ভীষণ ভয় করছে। এই শরীরটাকে এখন ধরে

ধরে শোবার ঘরে নিয়ে যেতে হবে। গায়ে হাত দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে তাকাতেই পারছি না ভাল করে।

পদ্মা ঘরে চল।

না-আ, আমায় অপমান করেছে। বিচার চাই, বিচার।

তুমি ঘরে চল।

পদ্মা টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে পিছোতে শুরু করেছি। এ আমার মেয়ে নয়, অপ্রকৃতিস্থা এক মহিলা!

তুমি ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছ কেন জর্জ! পেতনী তোমাকে ধরবে? অ্যাঁ, পেতনী পেতনী!

পদ্মা, আমি তোর বাবা, জর্জ নই, তোর বাবা!

পদ্মা ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মারল, মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী! তারপর একেবারে কাটা কলা গাছের মত পালিশ করা মেঝের ওপর উল্টে পড়ল।

আর একটা চড় কষিয়ে গেল অজয়। আমি সেদিন সারারাত ভেবেছি। পদ্মার ভবিষ্যৎ কী হবে? অজয়ের মত সৎ নির্লোভ, সহিষ্ণু স্বামীর হাতে পড়লে মেয়েটা বেঁচে যেতে পারে! শুধু পদ্মা বাঁচবে না, আমিও বেঁচে যাব। আমার ছেলে নেই, অজয়ই হবে আমার ছেলের মত। যে বলতে পারে, লাখ টাকা পেলে ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দোব, তার হাতে আমার বিশাল এই ঐশ্বর্য ছেড়ে যেতেও সুখ। সব থাকবে, সব রাখবে, সব বাড়াবে আরো আরো বাড়াবে।

সন্ধের দিকে, গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। সূর্য ডুবে গেছে অন্ধকার তেড়ে আসছে চার পাশ থেকে। সকাল থেকেই অজয়কে মনে হচ্ছে আমার ছেলে, আমার জামাই।

কাল তোমরা কোথায় কোথায় গিয়েছিলে অজয়?

অনেক জায়গায় স্যার।

স্যার বল না, কানে খট খট করে লাগে। আমি স্যার নই, সামান্য মানুষ, তোমার বন্ধুর মত।

আপনিই বলেছিলেন।

আমিই বলছি, আর বল না। কাল কোথায় কোথায় গেলে?

ময়দান, ফ্লুরি, ট্রিঙ্কাস, স্কাইরুম, হাজরা, ভিক্টোরিয়া,∴ যখন যেখানে হুকুম হয়েছে।

তুমি বাধা দিলে না কেন?

আমি সামান্য ড্রাইভার, হুকুমের চাকর।

তুমি যদি আর ড্রাইভার না থাক, আরো কাছে, একেবারে কাছে সরে আস?

তার মানে?

তোমাকে আমি চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে চাই আমার ছেলের মত করে, জামাই করে। অজয়, তোমার হাতে আমি পদ্মাকে দিয়ে যেতে চাই। অজয়ের কব্জিতে আমার একটা হাত।

তা হয় না, হিন্দী ছবি হয়ে যাবে।

কেন হয় না! আমি যে ভেবেছি। অনেক ভেবেছি। আমার ছেলে নেই, তাছাড়া সবই আছে। তুমি আমার সেই ছেলের মত।

স্ট্যাটাসে মিলবে না, আপনি নিলেও আপনার মেয়ে আমাকে নিতে পারবে না, আমিও আপনার মেয়েকে সহজ করে স্ত্রী হিসাবে মানতে পারবো না। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটা বারে বারে বেরিয়ে আসবে।

তাই আসে, বড়লোকের মেয়ে আর গরিবের ছেলেকে মিলিয়ে দিলে স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্পর্ক আর থাকে না। রঙে রঙে মেলাতে হয়।

তুমি তো আর গরিব থাকছ না, বড়লোক হয়ে যাচ্ছ, আমার পার্টনার, আমার পি. এ, অ্যাসিস্টেন্ট, সব কিছু।

আমি যে বড়লোক হতে চাই না।

তোমার লোভ নেই? উচ্চাশা নেই?

লোভ তো থাকে না, তৈরি করতে হয় উচ্চাশা! এক একজনের এক একরকম আশা, তার পেছনেই সে দৌড়য়।

অজয়, আমার বড়ো ইচ্ছে, তুমি বেঁকে থেকো না।

আমি যে স্বার্থপর হতে পারবো না।

স্বার্থপর!

হ্যাঁ, আমার মা-বাবা ভাই-বোন পড়ে থাকবে নিচে, আর আমি ফানুসের মত উঠে যাব উপরে, তা হয় না।

তাঁরাও উঠবেন, তোমার সঙ্গে সঙ্গে উঠবেন।

ক্রীতদাস কারোকে তোলার ক্ষমতা রাখে না। স্বাধীন মানুষই কিছু করতে পারে। আপনার পয়সা আছে, আপনি আমার চেয়ে অনেক অনেক ভাল ছেলে পাবেন।

এই তোমার শেষ কথা ?

ঘাসের গালচে থেকে নিজেকে তুলে নিতে হল। মানুষ কেন মানুষের কাছে সহজে আসতে চায় না! অজয় গাড়িতে স্টার্ট দিল। কঠোর চরিত্রের ছেলে। কংক্রিটের বাঁধুনি। কিছুতেই নোয়ানো যায় না।

পরের দিন সকালে অজয় আর এলো না। একজন বয়স্ক মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে অজয়ের চিঠি। অজয় লিখছে, অসুবিধে হবে ভেবে এই বিশ্বাসী মানুষটিকে পাঠালুম। এঁর হাত ভারী ভাল। একদিন চালালেই বুঝতে পারবেন। আমাকে যা দিতেন তার চেয়ে কিছু বেশি দিলে ভাল হয়, এঁর সংসার অনেক বড়।

আমি দুর্গাপুরে ভাল একটা চাকরি পেয়েছি। আজই চলে যেতে হচ্ছে। সকালের ট্রেনে। ছুটিতে এসে দেখা করব। আপনি আমাকে যেমন ভালবেসেছিলেন, আমিও তেমনি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছিলুম।

অনেক দিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলুম, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য মানুষকে বড়ো নিঃসঙ্গ করে দেয়। আপনার বেদনা আমি বুঝি। উপায় নেই, সহ্য করতেই হবে। ধনবান আর কুষ্ঠ রোগী প্রায় সমান। প্রণাম নেবেন। অজয়।

বামুনের গরু

শীতকাল। ভোর পাঁচটা মানে ভদ্রলোকের মাঝরাত। ছাত্রজীবন চলে গেছে, ঘুমও গেছে। সে জীবনে বই খুললেই চোখ জুড়ে আসত কালনিদ্রায়। মাথার ওপর পরীক্ষার খাঁড়া ঝুলছে। সামনে খোলা অর্থনীতির বই। মাথা লটকে আছে চেয়ারের পেছনে। ঠোঁট ফাঁক। ফুড়ুত ফুড়ুত নিঃশ্বাস পড়ছে। কিল, চড়, ঘুষি, কানমলা, নস্যি, অন্ধকার ভবিষ্যতের ছবি, কোন কিছুতেই ঘুম আর বাগ মানে না। সংসার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। চিত হলেই বুকের দুপাশে পা ঝুলিয়ে গেড়ে বসে দুশ্চিন্তায়! রাতের এখন তিন পর্ব। প্রথম পর্বে সমভূমিতে পাশাপাশি শুয়ে শ্বশুর-মশাইয়ের দেওয়া ক্লান্ত উপহারের সঙ্গে এটা ওটা সেটা নিয়ে ঠুস-ঠাস ফোঁসফাঁস। অন্তে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠদেশ ঠেকিয়ে দেয়ালমুখো হয়ে ক্ষতস্থান লেহন। তদন্তে উসখুস, উসখুস করে সন্ধিস্থাপন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর। উই আর অন দি সেম বোট ফাদার, উই আর অন দি সেম খাট মাদার বলে ভাবাশ্রু বিসর্জন। দেখতে দেখতে পাশ্বর্বর্তিনীর নাসিকা-গর্জন। তখন কারবালার সেই শূন্য প্রান্তরে রাত-জাগা ঘুঘু হয়ে বিচরণ। মহাশূন্য হেঁকে বলে—মনে করো, মনে করো, শেষেরঅ সেদিনঅ কী ভয়ঙ্করঅ। অতঃপর আয় ঘুম, ঘুম আয়। সাধ্য-সাধনা। ঘুম এল দুস্বপ্নের ভেজাল নিয়ে। শেষ পর্বে পরাজিত কুস্তিগির বেহুঁশ!

আর তখনই নড়ে উঠবে কড়া। এলেন। তিনি এলেন। ভি. আই. পি নাম্বার ওয়ান।

মাথার ওপর ধামা খোঁপা। পুরু ঠোঁটে বিগত রাত্রির তাম্বুল রাগ। কণ্ঠে সাত সাগরের গরল। চোখ ঘুরে কুঁচ ভাঁটা জিনি ইন্দিবর নাটা। পিলে কাঁপিয়ে কড়া নড়বে তিনবার। তারপর দৈববাণী, আমি তাহলে চললুম। শুয়ে শুয়ে মিঞাও শুনছেন, বিবিও শুনছেন। দুজনেই পড়ে আছেন মটকা মেরে। যার গরজ বেশিই তিনিই তড়াক করে লাফিয়ে উঠবেন। আমি তা হলে চললুম শুনে মিঞাই ওঠেন, ঠেলে না, যেও না, রজনী এখনও বাকি, আমি রাত জাগা পাখি। একবার লাইন কেটে গেলে তুমি সাত বাড়ি সেরে আসতে আসতে, এ সংসারে আগুন জ্বলে যাবে। আমি গেলে সংসার অচল হবে না। ইনসিওরেনস্, প্রভিডেন্ড ফান্ড, ফিক্সড ডিপোজিট্, ফ্যামিলি পেনসানে ভালই চলবে। তুমি গেলে দিনমণি, এ-পরাণ যাবে। খাবার ঘরে জগাই-মাধাইয়ের সংসার গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাসনের পাঁজা। গেলাস লাট খাচ্ছে। বেসিনে কাপ-ডিশ গণকবরের মৃতদেহের মত ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে আছে। ভুক্তাবশেষ নিয়ে ধেড়েরা সারা রাত দাবা খেলেছে! দুধের বাটিতে জল ঢেলেছিল, তার ওপর ওষুধের ফেলে দেওয়া ফয়েল ভাসছে। হেলে হেলে দুলে দুলে। ভিটামিন, অম্লনাশক, মাথাধরা, অনিদ্রা। বাবুদের হেঁশেল নয় তো আঁস্তাকুড়। এ জিনিস ওই প্রাতঃস্মরণীয়ার ভরসাতেই সৃষ্টি করা যায়। সকালে সাফ করার নাম শুনলেই স্বেদ, কম্প, পুলক জাগে। বিষাদযোগ তৈরি হয়। হাত ঠেকাতেই ঘেন্না হয়, মেগেঃ। কলকাতার ট্রাফিক-জটের মত। ভয়ে পুলিশ ভাগে। সৃষ্টির সামনে পা ছড়িয়ে বসে স্রষ্টারা হাপুস নয়নে কাঁদে। ওগো! কী হবে গো, তারার মা আসছে না। তারার মা না এলেই চোখে অন্ধকার। কনডিশান রিফলেকস্ বলে একটা ব্যাপার আছে, যেমন খাবার দেখলেই নোলায় জল আসা। হাত তুললেই চমকে ওঠা। ভোরে কড়া নাড়বে ভেবে জেগে উঠে চোখ পিট পিট করা। এই এলো এই এলো করে রাত ফর্সা হয়ে গেল। সামনের বাড়ির পুবের পাঁচিলে হলুদ রঙ ধরল। তারস্বরে কাক ডেকে উঠল। রাতে যে সব কল বন্ধ করা

হয় তার মুখ দিয়ে দামাল ছেলের মত জল নামল লাফিয়ে লাফিয়ে। তবু মনে হতে লাগল বাড়ি সার্জিক্যাল থিয়েটারের মত শান্ত। তারার মা ঠুকে ঠুকে বাসনে টোল ধরাচ্ছে না। করকরে ছাই ঘষে ঘষে দুধের ডেকচির বারোটা বাজাচ্ছে না। স্টিলের গেলাসে ফুটবলের শট হাঁকড়াচ্ছে না। বাবুদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে না। বেলা দেখে মনে হচ্ছে আজ লাইনটা কেটে গেছে। আসতেও পারে নাও পারে!

বিপদ দেখলে খরগোশ কী করে? মাথাটা গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে পেছনের দিকটা উঁচু করে রাখে। ভাবে খুব লুকোনো হল। শত্রু পেছন দিক থেকে এসে পশ্চাদ্দেশটি ধরে গর্ত থেকে টেনে বের করে আনে। বালিশে মুখ গুঁজে পেছনে উলটে শুয়েছিলুম। প্রথম চোট কেটে যাক, তারপর সংসারের চাতালে নেমে তাল ঠুকব। সে আর হল না। পেছনে একটি মোলায়েম খোঁচা।

'দরজা খুলে দাওনি?'

'কাকে খুলব?'

'কেন রোজ যাকে খোলো!'

'তিনি না এলেও খুলে বসে থাকব! এসো হে, এসো হে, প্রাণসখা!'

'ঠিকই এসেছিল, তুমি মটকা মেরে পড়েছিলে, বদমাইশি করে। তোমাকে আমি চিনি না! হাড়ে হাড়ে চিনি। বাঁশ দেবার সুযোগ পেলে তোমাকে আর পায় কে!

'বাজে কথা বোলো না। রোজ কে দরজা খোলে? মটকা মেরে যদি কেউ পড়ে থাকে, সে হলে তুমি! দরজা খুলে দিয়ে যেই বিছানায় ঢুকি, অমনি তুমি কুঁই কুঁই করে হেসে বল, আবার নতুন করে শুচ্ছ কেন, এখুনি তো বাজার যেতে হবে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।'

'যার যা ডিউটি।'

'আমি মারা গেলে? তখনও কি ভূত হয়ে এসে তোমার তারার মাকে দরজা খুলে দিতে হবে?'

'সাতসকালে একদম বাজে কথা বলবে না। ভোরে ঘুম থেকে উঠলে তোমারই ভাল। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, মন মেজাজ খুশি খুশি হবে। তাড়াহুড়ো হবে না, আয়েশ করে অফিস যেতে পারবে।'

'থাক। আমার ভাল আর তোমাকে দেখতে হবে না। যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। এখন ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।'

'আহা! মামার বাড়ি! আলোয় আলোয় আমাদের হাতে হারিকেন ধরিয়ে চলে যাই! ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন! নাও উঠে পড়।'

'উঠে কী করতে হবে! বাসন মাজতে হবে! ঘর ধুতে হবে?'

'আজ্ঞে না। জীবনে তো কুটোটি নেড়ে উপকার করনি। রেখাদির মত বরাত করে কি আর জন্মেছি যে সাতসকালে স্বামী এসে চায়ের কাপ সামনে ধরবে। বউকে সাজিয়ে রাখবে শোকেসে। আমার হামানদিস্তের বরাত। সারা জীবন থেঁতো হবার জন্যেই জন্মেছি। এখন দয়া করে উঠে পায়ে চটিটা গলিয়ে ওই সামনের বাড়িতে গিয়ে একবার খবর নিয়ে এসো, মুখপোড়া ওখানে আগে গিয়ে মরেছে কি না!'

যথা আজ্ঞা। মাঠ পেরোলেই বলাইদের বাড়ি। যতই করি না কেন রেখাদির স্বামী হতে হচ্ছে না। একবার শুকসারী দম্পতিকে যদি চর্মচক্ষে দেখতে পেতুম, স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতুম, আপনারা মশাই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে আমার বারোটা এভাবে বাজাচ্ছেন কেন?

বলাইদের বাড়ির সদর হাট খোলা। ভেতর উঠোন স্পষ্ট চোখে পড়েছে। পা তুলে সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। বলাইয়ের মা গামছা পরে তারে থান মেলছেন। দৃশ্যটা বড় অপূর্ব। উঁকিঝুঁকি মারাটা ঠিক হচ্ছে কি? হচ্ছে না। প্রাণের দায়ে এই প্রাতঃদর্শন। পাশের জানালা এক চিলতে ফাঁক করে আমার এই অপরাধের ওপর যে কেউ চোখ রাখতে পারেন, ধারণাই ছিল না। 'পিপিং টম' হবারও একটা আর্ট আছে। জানালা ফুঁড়ে কাংস্যকণ্ঠ বেরোল, 'কী চাই?'

বাপস্, বলাইয়ের সেই বিখ্যাত বউ। চেহারা দেখলে মনে হয় সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাত। ঢোক গিয়ে বললুম, 'আপনাদের বাড়িতে তারার মা কাজে এসেছে?'

'কেন, ফুসলে নিয়ে যাবেন?'

আরে রাম কহো ভাই। ওই পাথরপ্রতিমাকে ফুসলে নিয়ে

গিয়ে রাখব কোথায় ? মুখে বললুম, 'আজ্ঞে না, আমাদের বাড়িতে আসেনি তো ! ভাবলুম এখানে যদি এসে থাকে !'

'আসেনি। আমি তো ওকে আপনাদের বাড়িতেই পাঠালুম উঁকি মেরে চুপি চুপি দেখে আসার জন্যে। আপনাদের আদরেই তো বাঁদর হয়ে বসে আছে। কী মুখ হয়েছে আজকাল।'

আমাদের বাড়ির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল স্যাণ্ডো গেঞ্জি-পরা বোকা বোকা চেহারার এক দৈত্য মিটার ঘরের পাশে ঘাপটি মেরে লম্পট জমিদার পুত্রের মত উঁকি ঝুঁকি মারছে। আরে ওই তো বলাই ! চোখাচোখি হয়ে গেল। বলাই ফিরে এসে বলল—

'আসেনি দাদা ?'

'না রে ভাই। কি বিপদেই যে পড়া গেছে !'

বলাই জানালার দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনলে, আসেনি। আমার কথা তোমার বিশ্বাসই হয় না।'

জানালা বললে, 'এলে আমি ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম।'

'তোমরা লোকের সঙ্গে বড়ো খারাপ ব্যবহার কর, তাই কেউ টেঁকে না।'

'ওই তো যিনি ভাল ব্যবহারের বড়াই করেন তাঁরও তো একই অবস্থা। মেয়ের বিয়েতে চুড়ি দিয়েছিলেন। মান রেখেছে !'

'আমি তারার মেয়ের বিয়েতে চুড়ি দিয়েছিলুম ? কে বললে আপনাকে ? আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে।'

'তারার মা বলেছে। আমাদের বললে, আপনি চুড়ি দিচ্ছেন, জামাইয়ের আঙটিটা আমাদের দিতে হবে। আমি ধারধোর করে একশো টাকা দিয়েছিলুম।'

মহিলা গলা দিয়ে যে শব্দ বের করলেন, তাকে বলে আর্তনাদ। 'কী সর্বনেশে মেয়েমানুষ গো ! ওই ব'লে এই বোকা লোকটার কাছ থেকে পাঁচ আনা সোনার একটা আঙটি ভোগা দিয়ে নিয়ে গেল ! কী পাল্লায় পড়েছি ! আমার কী হবে গো !'

বলাই বললে, 'সাতসকালে আর চেঁচিয়ো না তো ! খুব হয়েছে ?'

'না চেঁচাবে না ! তোমার মত বোকা আর পৃথিবীতে দুটো আছে ! মেয়েছেলে দেখলেই বাবুর ন্যাজ একেবারে পটাস পটাস

নড়ে উঠল। এমনি হাত দিয়ে পয়সা গলে না। আমার ভাইয়ের বিয়েতে একটা শাড়ি ঠেকিয়ে সরে পড়ল।'

'কাজের লোককে একটু তোয়াজে রাখতে হয় গবেট। তোমার ভাই এসে বাসন মাজবে?'

উপরে দমাস্ করে জানালার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। বলাই বললে, 'আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেছে তো মশাই?'

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির প্রবীণ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন, 'কী হল কী আপনাদের? সাতসকালেই মড়াকান্না! বলাই বউমাকে ধরে পেটালে না কি?'

'পেটাব কেন? ঝি আসেনি।'

'তাইতেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল! একদিন নিজেরাই না হয় করে নিলে?'

বাড়ি ফিরতেই গরম হাওয়ার স্পর্শ। 'কী করছিলে কী এতক্ষণ?'

'কী আর করব? ওদের বাড়িতেও আসেনি।'

'মরে গেছে। কাল চিংড়ি মাছ খেয়েছিল, তোয়াজ করে খাইয়েছিলুম, কলেরা হয়ে মরেছে! ওই তো আমতলার বস্তি, যাও না একবার খবর নিয়ে এস।'

'ওখানে আমি যেতে পারব না, তোমার সব ছাঁটাই করা দশাসই মেয়েছেলেরা আমাকে চাঁদা করে ঠেঙাবে।'

'তুমি কিছুই পারবে না। আমিই যাই। আমার তো আর বসে থাকার বরাত নয়। সৃষ্টি পড়ে আছে। আসবে কি আসবে না।'

'অত হাঙ্গামা না করে, এসো না, দু'হাতে ঝটাপট সেরে নি।'

'কালকে ঘি-ভাত খাওয়া হয়েছিল, সব বাসনে তেল বেড় বেড় করছে। গেলাসে পারশে মাছের আঁশটে গন্ধ। ও তোমার আর আমার কম্ম নয়।'

'একটু চা হলে হত না!'

'একদিন নিজের গতর নাড়িয়ে চা-টা কর না। যেখানে থাক, আমিও ওর ঘাড়টা ধরে টেনে আনি।'

গেল তো গেলই। ফেরার আর নাম নেই। না পারছি বাজার

যেতে, না পারছি দুধ আনতে। সব স্ট্যান্ড স্টিল। অবশেষে তিনি ফিরলেন।

'কী রিপোর্ট ?'

মোড়ায় ধপাস করে বসে পড়ে বললে, 'আগে এক গেলাস জল।'

জল কোথায় ঢালবে ? মাথায় না গলায় ! জল খাওয়া হল। 'আঃ।'

'বলো, কী রিপোর্ট !'

'তিনি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। জ্বর হয়েছে, সুখের জ্বর। কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলুম। বড় বড় নখ নিয়ে এমন খামচে দিলে। দেখি একটু ওষুধ দাও তো। জলাতঙ্ক না হয়। এ টি এস নিতে হবে।'

'না না, এ টি এস নিতে হবে কেন ! তুমিও যেমন।' প্রাণি-জগতে দুজন মহিলার মুখোমুখি দেখা হলেই একটু আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি হবেই। দুটো বেড়াল। ফেস টু ফেস, ঠুসঠাস, ফোঁসফাঁস।

ওষুধ লাগাতে লাগাতে বললে, 'দিয়েছি আজ বারোটা বাজিয়ে।'

'কীভাবে বাজালে ?'

'এত বড়ো পাজি মেয়েমানুষ, ছোট মেয়েটাকে কাজে বের করে দিয়েছে ! আমাকে বললে, না তো, পাঠাইনি তো ! কালী-বাড়ির পাশে গুঁইদের ওখানে গিয়ে দেখি রক ধুচ্ছে। ফের ফিরে গেলুম। কি গো, তুমি যে বললে মেয়েকে কোথাও পাঠাওনি ! এই তো দেখে এলুম কাজ করছে। তখন বলে কি না ওটা আমার বেশি টাকার বাড়ি। আমি বলে এসেছি তুমি আর তোমার মেয়ে যদি এমুখো হও, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দোব। তুমি এখুনি একটা লোক দেখ।'

'সাধনা করলে ঈশ্বর পাওয়া যায়, কাজের লোক পাওয়া অত সহজ নয়। এ তুমি কী করলে ? ওদের ইউনিয়ন আছে। কেউ আর এ বাড়িতে আসতে চাইবে না।'

'ঝাঁটা মারি ইউনিয়নের মুখে। তুমি অন্য জায়গা থেকে লোক আনাও। থাকা, খাওয়া, পরা। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও।

ভাগলপুর, বিলাসপুর, কানপুর, যেখান থেকে পার। চেষ্টা করলে কী না হয়!'

'তা ঠিক। পিসির গোঁফ গজিয়ে পিসে হয়, মাসি মেসো হয়।'

এদিকে লণ্ডভণ্ড বকাণ্ড অবস্থা। মেজাজ সব ফাইভফর্টি ভোলট। বাসন কমাবার জন্য সব পাতে পাতে চলেছে। ভাত ডাল, ঝাল, ঝোল, সুক্তো, চাটনি সব মিলেমিশে একাকার। যা উদরে মিশতো, তা পাতেই মিশে মিকস্চার হয়ে গলকম্বল গলে ইঞ্জিনে পড়তে লাগল।

এভাবে তো চলে না। একটা কিছু করতেই হয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, মুখে পান ঠুসে, গাল গুলি করে, নেচে নেচে সব কাজে চলেছেন বাড়ি বাড়ি। কয়েকজনকে মনে ধরলেও মার খাবার ভয়ে সাহস করে বলতে পারি না, হ্যাঁগা আমাদের বাড়িতে কাজ করবে? দাদাঠাকুরের মত গান গেয়ে গেয়ে ঘুরতে হবে নাকি— বাসন মেজে দাও, মেজে দিলে শাড়ি দোব, বাটা ভরা পান দোব, পুজো এলে ধনেখালি দোব, মেয়ে হলে নোলক দোব, জামাই হলে জুতো দোব, মাংস হলে ভাগ দোব, পেটে এলে দুধ দোব!

হাতের কাছে যাকেই পাই দু'চার কথা হবার পর জিজ্ঞেস করি, জানাশোনা কেউ আছে? দিন না ভাই, একটা লোক জোগাড় করে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক! বড়ো আদরে থাকবে। রিকশায় উঠে রিকশাঅলাকে বলি। ট্যাকসিতে উঠে ড্রাইভারকে বলি। ডাক্তারখানায় বসে সহরোগীকে বলি। চোখ দেখাতে গিয়ে অন্ধকার ঘরে ডাক্তারবাবু নাকের কাছে ঝুঁকে পড়ে যখন আলো ফেলছেন তখনও আমি ফিস ফিস করে বলে ফেলি, কাজের লোক আছে? পরিচিতের বাড়ি গিয়ে সব ছেড়ে প্রশংসা করে উঠি, আহা মেয়েটি বেশ! কোত্থেকে পেলেন! গৃহস্বামীর ভুরু কুঁচকে ওঠে। ভাবেন চরিত্রে চিড় ধরেছে।

একটা সময় এল, যখন কারুর সঙ্গে দেখা হলেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলেন, কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু বলার থাকে বলুন। অনেকে আবার দেখামাত্রই দৌড়তে শুরু করলেন, ওই রে আসছে রে। এদিকে গৃহের গঞ্জনা দিনে দিনেই বাড়ছে। পরিস্থিতি চরমে উঠল, যেদিন পাশের বাড়ির ব্যোমকেশবাবু

সোনারপুর থেকে একটি ডাগর-ডগর ফুলটাইমার নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। সে কী উল্লাস। উলুধ্বনি, সহর্ষ আর্তনাদ। পেছনে পেছনে প্রবেশ করল ফুলশয্যার তত্ত্বের মত নতুন বিছানা, মশারি, বালিশ, জারুল কাঠের খাট। রেকর্ড প্লেয়ার বেজে উঠল, আও না পেয়ার করে, লাচ করে, ডিসকো দিওয়ানে, আহাঃ আহাঃ। ব্যোমকেশবাবু যেন বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বাড়ি ঢুকলেন।

ছাদে দাঁড়িয়ে এই সব দেখতে দেখতে গৃহকর্ত্রীর বিদ্যুৎ-পরিবাহী নালিকায় হাই ভোলটেজের সঞ্চার হল। তিনি বজ্রের মত, অগ্নির মত, কামানের গোলার মত ফেটে পড়লেন। 'অপদার্থ', ওই দেখ, করিতকর্মা পুরুষ কাকে বলে। চোখে চালশে, রক্তে শর্করা, তবু তিনি যা করলেন!' কী করলেন? যেন বিলেত থেকে আই. সি. এস হয়ে এলেন।

জগৎ-সংসার সম্পর্কে যাঁদের অসম্ভব জ্ঞান, যাঁরা এ হাটে কিনে ও হাটে বেচেন, তাঁদেরই একজন বললেন, ওভাবে হবে না বন্ধু। লোক ভাঙাতে হবে, এজেন্ট ফিট কর। ওই পুষ্পিতালতাকে রোজ লোভ দেখাতে হবে। আরও নরম মোটা গদি, নেটের মশারি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় টি. ভি, রবিবার সিনেমা। আরও, আরও দোব।

'সে তো ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি!'

'সেই যুগই তো পড়েছে ভাই। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। মলের চেয়ে চুটকি ভারী। বেকারে দেশ ছেয়ে গেলেও কাজের লোক তুমি সহজে পাবে না। সবচেয়ে সহজ হল আর একটি বিবাহ করা। পাত্রী তুমি সহজেই পাবে। বিনাপণে করতে চাইলে, পুলিশ ডেকে তোমাকে ফিলম্‌স্টারের মত সামলাতে হবে। বড়র জন্যে মেজ আন, মেজর জন্য সেজ। বামুনের গরু ভাই। খাবে কম দুধ দেবে বেশি।'

ট্রিটমেণ্ট

জিভ বের করুন—হুঁ।

বাাা করুন—হুম। চশমা খুলুন, দেখি, চোখ দেখি। হুম।

চোখটা বেশ লাল হয়েছে। চুলকোয়। কড়কড় করে। ক্লোরোমাইসিটিন অ্যামিক্যাপ…'

আমার কাছে বলে লাভ নেই। চোখের ডাক্তার দেখান। দেখি জামাটা তুলুন। না না গেঞ্জি তোলার দরকার নেই।

নিশ্বাস। জোরে জোরে। পেছন।

হুম, ভেতরে চলুন।

সুইং দরজা ঠেলে ভেতরের ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকে জানালা ঘেঁষে উঁচু বেনচ। পলিথিনের চাদরে ঢাকা বিছানা। মাথার দিকে নিরেট বালিশ। উঠে শোবার জন্যে পাইন কাঠের দুটো স্টেপ। সামনের দেয়ালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বড় ছবি। তলায় লেখা, জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তার তলায় ব্যায়রাম=ব্যয় করলেই আরাম।

নিন শুয়ে পড়ুন। দেখে, দেখে, জানলার পাল্লা। বাবা, কত কি পরে বসে আছেন মশাই! করেছেন কী?—পেট খালি করুন, খালি করুন। লাগে? লাগে?

এই লিভারের কাছটায় যেন…

লিভার কি স্টম্যাক জানি না। যেখানটা টিপছি সেখানটায় লাগে কি না?

একটু যেন লাগছে।

হুম। উঠে পড়ুন। সাবধান জানলা।

আমাকে সাবধান করে, ডক্টর চৌধুরী পূর্বদিকের দেয়ালে ফিট করা ওয়াশ বেসিনে হাত ধুতে গেলেন। ডক্টর নিরঞ্জন চৌধুরী, এম আর সি পি লণ্ডন, এম ডি ক্যাল, ডি টি এম, এফ আর এস, সি আই এফ, এফ ও বি, ডক্টর জনার্দন চৌধুরীর ছেলে।

নামবো ?

নামবেন না তো কি বসে থাকবেন !

ভয়ে ভয়ে নেমে পড়লুম। নামবার সময়ে পা লেগে কাঠের ধাপ দুটো সরে গিয়ে একটু টাল খেয়ে গেলুম। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, প্রেসার আছে ? মুখটা কাঁচুমাচু করে বললুম, অ্যাবনর্ম্যালি লো, নাইনটি, ফিফটি।

হুঃ। কী করে বুঝলেন, অ্যাবনর্ম্যাল ? প্রেসারের কী বোঝেন ? সাবনর্ম্যাল বা নর্ম্যালও হতে পারে। কথা বলতে বলতে আমরা বাইরে এসে বসেছি। নেপোলিয়ানের কত প্রেসার ছিল ? রোমেলের, আইজেনহাওয়ারের, চার্চিলের ? আমি বোকার মত উত্তর না জানা ছাত্রের মত তাকিয়ে রইলুম। ডাক্তার নিচু হয়ে প্রেসার মাপা যন্ত্র বের করতে করতে বললেন, সকলেরই প্রেসার লো ছিল। ওটাই ছিল ওঁদের নর্ম্যাল। আপনি নর্ম্যাল অ্যাবনর্ম্যালের কী বোঝেন ! মাথা ঘোরে ?

মাঝে মাঝে বোঁ করে ঘুরে যায়।

বোঁ করে কেন ? বোঁ মানে কী ? কথায় কথায় প্রত্যয় লাগানো অভ্যাস। ব্যাড হ্যাবিট। আপনার মাথা ঘোরে উইণ্ডে মশাই, উইণ্ডে। হাওয়ায় পৃথিবী ঘোরে। মোগলাই চলে ? কাটলেট, ফিশ ফ্রাই ? রক্তের চাপ মাপা যন্ত্রের ওঠানামা থেকে কী বুঝলেন তিনিই জানেন। ফ্যাঁস করে হাওয়া বের করে দিয়ে পটিটা খুলতে খুলতে বললেন, কে বলেছে নাইনটি, ফিফটি ?

ডক্টর সাহা বলেছেন, আমার অফিসের ডাক্তার।

যন্ত্রটা ফেলে দিতে বলুন। ক'জন ডাক্তার প্রেসার দেখতে জানে ? ক'জন ডাক্তার ফুসফুস পড়তে পারে ? হার্টের মার্মার ধরতে পারে ? আপনার প্রেসার হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড সিকসটি। লট-

বছর লম্বা বাক্সে পাট করে গুছিয়ে রাখলেন। প্রেসার যন্ত্র আমিও লক্ষ করে দেখছি। হাওয়ার চাপে পারার মাথাটা ঠেলে ওঠে। তারপর আবার হুস হুস করে নামতে থাকে। এই ওঠা নামার প্রেমের তুফানে কোথায় যে আমার প্রেসার বসে আছে কে জানে! ডাক্তারবাবু একটা স্লিপকাগজ টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বয়স কত? দুটো বছর গায়েব করে বললুম, আটত্রিশ। পেনসিল দিয়ে হিসাব করতে করতে বললেন, নাইনটি প্লাস থার্টি এইট ইজ ইকোয়ালটু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট। একশো আঠাশের জায়গায় একশো। কী এমন কম? একটু কম। মাসখানেক মুরগি, দুশ্চিন্তাহীন গভীর নিদ্রা, প্রচুর বিশ্রাম আর দু চামচে করে দু বেলা টনিক, দেখি আঠাশ কোথায় যায়! এখন বলুন ট্রাবল কী কী? ফরগেট ইয়োর প্রেসার। ইগনোর ইয়োর প্রেসার। মনে করুন, আপনি নেপোলিয়ান, রোমেল, কাইজার, উইলহেলম, সক্রেটিস, সফোক্লিশ, বায়রন, নিদশে।

ডাক্তারবাবু লিখতে শুরু করলেন। নাম্বার ওয়ান, শীত শীত করে জ্বর। জ্বর আসার আগে পায়ের পাতা বরফের মত ঠাণ্ডা। মর্নিং সিকনেস। টকাস করে পেনসিলটা ফেলে দিয়ে বললেন, তখন বলেননি কেন? তখন, যখন শুইয়ে ফেলে পেট টিপছিলুম। একটা কাজ একেবারে হবার উপায় নেই। রিপিটেড এফার্টস। একে কী বলে জানেন, নন কো-অপারেশন। এ শর্ট অফ ভায়োলেনস অন মাই কস্টলি টাইম। শুনুন, অসুখ যদি চেপে রাখতে চান রাখুন, আমি ওই ইনকমপ্লিট ডায়াগনসিসের উপরই চিকিৎসা করব। আর যদি কিওর চান, বি ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক। পড়েননি ডাক্তার রোগীর বন্ধু রোগ নিবারণে, ধর্মই সবার বন্ধু জীবনে মরণে।

ফ্র্যাংকলি বলছি ডাক্তারবাবু, গোপন করা বা নন কো-অপারেশন বা ভায়োলেনস আমিও পছন্দ করি না।

আমি তখন পিনপয়েন্ট করে কুহুনাড়ির সংকোচনের কথা বিশদ করলুম।

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রোগের সঙ্গে যোগের কী সম্পর্ক?

বাঃ সম্পর্ক নেই! হটযোগ দীপিকা, পাতঞ্জল, এঁরা কী বলেছেন? এইবার আমার কোর্টে বল। বত্রিশ টাকার ডাক্তারকে এবার আমার গোল দেবার পালা। এঁরা বলেছেন শরীরম আদ্যম। সুশ্রুত বলেছেন বিসর্গদান বিক্ষেপৈঃ সোমসূর্যা নিলো যথা। ধারয়ন্তি জগদ্দেহ্য কফপিত্তানিলস্তথাঃ। অর্থাৎ সোমসূর্য অনিল অর্থাৎ বরুণ, অগ্নি, ও বায়ু, এই ত্রিদেবতা যেমন বিশ্বসৃষ্টি এবং বিশ্বের রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন, তেমনি আবার এই ত্রিদেবতাই দেহবিশ্বকে পালন ও পোষণ করিতেছেন। দেহস্থ এই ত্রিদেবতার নামই আয়ুর্বেদমতে···বায়ু, পিত্ত ও কফ। ডাক্তারবাবু পেনসিল নামিয়ে রেখে বেজার মুখে বললেন, তা হলে আপনার ট্রিটমেন্টটা সুশ্রুতকে দিয়েই করান। আমার ভ্যালুয়েবল টাইম আর নষ্ট করবেন না।

প্রথম শুরু তো হ্যানিম্যান সাহেবকে দিয়ে করেছিলুম। প্রথমে সালফাব খেয়ে সিসটেমটাকে নিউট্রাল করে নিয়েই নাকসভোমিকা ঝেড়েছিলুম। মেথডটা বড় স্লো। ধৈর্য রইল না। তখন সুইচ-ওভাব করলুম কবিরাজিতে। অনুপানেই মেরে দিলে। নিমগাছের ডাল থেকে ঝোলা গোলঞ্চ কুলেখাড়া, ক্ষেত পাঁপড়া, জটামাংসী, দারুহরিদ্রা, মহাজ্বালা তারপর মধু। সবতেই মধু, ওঁ মধু। এর ওপর খলে মারা। সকালটা যদিও চলে, দুপুর আর সন্ধে। তখন তো অফিসে! তাছাড়া ওই অরিষ্ট ডিফেকটিভ প্রেপারেশন। শিশিতেই ফাংগাস হয়ে যায়। অরিষ্ট খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুক্রিম আর জুতো ঝাড়া বুরুশ দিয়ে শরীরের ত্বক পালিশ করতে হয়। তা না হলেই বর্ষায় ভেজা সাদা সাদা ছাতধরা শালখুঁটির মত চেহারা হয়। তখন সুইচওভার করলুম যোগে।

এইবার সুইচ অফ করে কাজের কথায় আসুন, বুঝতেই পেরেছি অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। ডাক্তারবাবু পেনসিল তুলে নিলেন। বিবাহিত? প্রশ্ন শুনে বুঝেছি চরিত্রের ওপর ডাক্তারের কটাক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলুম, না না সে সব নয়। তবে আমার দাদু বলেছিলেন ডায়াবিটিস কিনা একবার আপনাকে দিয়ে চেকআপ করাতে।

বুঝেছি, যার যা অসুখ আছে সব আপনাকে ঘাড়ে চাপাতে

চাইছে। শুনে রাখুন, অসুখের কথা একমাত্র ডাক্তারকে বলবেন, যেমন ইষ্টদর্শনের কথা একমাত্র গুরুকেই বলতে হয়।

ডাক্তারবাবু রোগের ফর্দ ফেলে চুরুট ধরালেন। মোটা ডাক্তার, মোটা চুরুট, লম্বা পাইপ, বড় কর্তার রিভলভিং চেয়ার, থানার দারোগা, কোর্টের পেয়াদা, বাড়ির গৃহিণী, ধারদাতা মুদি, ইলেক-ট্রিক বিল, অফিস টাইমের বাস, বিয়ের চিঠি, শেষ মাসের আত্মীয়, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ, ট্রানজিস্টার রেডিও, বাজারের দরদাম, কোনো কিছুকেই আমি আর ভয় পাই না। সবকিছুর ক্যামোফ্লেজ আমি ধরে ফেলেছি। সব মানুষের মধ্যেই জ্ঞান আছে, অজ্ঞানতা *আছে, নীচতা আছে, উদারতা আছে, দয়া আছে, নিষ্ঠুরতা আছে,* ছাঁকনি ছাঁকা মানুষ হয় কি? হয় না। অতএব ভরা মুখে মোটা চুরুটে আমার রোগের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেই কি আমি সুস্থ হয়ে যাব। গাড়ি নিয়ে গ্যারেজ সার্ভিস এলে সব ডিফেক্টের কথা যেমন বলতে হয়, তেমনি আমিও হার্ট, লাংস, কিডনি, ব্রেন, লিভার স্টম্যাক সব জায়গার বাঁদরামি হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত করে ভাঙবো। ডাক্তারের চুরুট আমাকে দাবাতে পারবে না।

এক মুখ পোড়া-গন্ধ ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চালু করে দিলুম আমার কিডনি-কাহিনী। কিডনিটা একটু নন কো-অপা-রেশন করছিল। প্রথম দিলুম ব্যাটাকে যোগের কবলে। স্বামী যোগানন্দ অর্ধচন্দ্রাসনে রেখে দিলেন মাসখানেক। তারপর ধনুরাসন করতে গিয়ে এমন পারমানেন্টলি পেছন দিকে অর্জুনের গাণ্ডীবের মত বেঁকে গেলুম যেন কুমড়োর ফালি বা নৌকো। সেই ধনুক থেকে আস্তে আস্তে সোজা হতে তিন মাস লাগল। তখন ধরলেন ডাঃ ঘোষাল।

কোন ঘোষাল? খালধারের ঘোষাল? কে. ডি ঘোষাল? ডক্টর শার্ক? ধরলে ছাড়ে না সেই ঘোষাল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডকটর শার্ক নয়, কচ্ছপ। মেঘ না ডাকলে কামড় ছাড়ে না। ঘোষালের ওপর রাগ দেখে চৌধুরীকে উসকে দিলুম। আমার ওপর সিমপ্যাথি বাড়বে। সেই ঘোষাল চোখ কান বুজিয়ে একগাদা ডকসি সাইক্লিন খাইয়ে দিলেন। এক ধাক্কায় ফিফটি সিকস রুপিজ। না জোক। রেজাল্ট ড্রাগ রিঅ্যাকসন। হবেই

তো, হবেই তো। ডক্টরকে বেশ উৎফুল্ল দেখাল। আমার সর্বনাশে ওঁর যেন পোষ মাস! পা নাচাতে নাচাতে বললেন, কম রুগী মেরেছে! নিজেকে মনে করে যেন ডাক্তার গুডিভ!

আমি ছাড়ি কেন? একটু টিপ্পুনি যোগ করে দিলুম, যদিও আপনাদের শাস্ত্র বলে, শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ। ডক্টর ঘোষাল যদি হাজার কমপ্লিট করে থেকে থাকেন তাহলে এতদিনে চিকিৎসক হতে পেরেছেন।

ডক্টর ঘোষালের ডায়গনসিস্‌টা একবার শুনি। ডক্টর চৌধুরী ঘোষালের কেরামতিটা জানতে চাইলেন।

ডক্টর ঘোষাল বললেন, তিনটে কারণ থাকতে পারে। এক স্টোন, দুই ক্যানসার, তিন টি বি।

বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ! ডক্টর চৌধুরী আনন্দে আটখানা। জীবনে এত আনন্দ মনে হয় তিনি কখনো পাননি। সোজা হয়ে বসে বললেন, এই না হলে ডাক্তার! মার্ডারার। আমাদের প্রোফেসানের কলঙ্ক। দেখি আর একবার এদিকে আসুন তো। উঠে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। দুটো আঙুল দিয়ে গলা আর কানের পাশটা বেশ রগড়ে রগড়ে দেখলেন। নাঃ, কিছু নেই। টি বি অত সোজা নাকি। হলেই হল। আবার চেয়ারে ফিরে এলুম। ফের শুরু হল রোগের ফর্দ।

ভীষণ দুর্বলতা। বসতে পেলে শুতে চাই। ওজন ঝরঝর করে কমছে। বেলা তিনটের পর থেকে চোখ জ্বালা, জ্বর জ্বর, মাথা ধরা, শীত শীত, হাই ওঠা, অ্যালার্জি। মাঝরাতে ব্রিদিং ট্রাবল। জিয়ার্ডিয়া ছিল। অ্যামিবায়সিস যোগ হয়েছে। অম্বল। লিভারের ব্যথা। স্নায়বিক দুর্বলতা। হাত-পা অবশ হয়ে আসে, কাঁপে। অকালে চুলে পাক ধরেছে। মেলাঙ্কোলিয়া। পা ঝুলিয়ে বসলে চেটো দুটো বিকেলের দিকে গোদা গোদা হয়ে ওঠে। এক সাইজ বড় জুতো কিনেছি, সকালে বাড়তি শুকতলা দিয়ে পরি। বিকেলের শুকতলা দুটোকে পকেটে পুরি। ডক্টর চৌধুরী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইটুকু শরীরে এত অসুখের ঐশ্বর্য খুব কম দেখেছি মাইরি, এ-যেন সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। ফর্দাফাঁই রুগী। পোস্টমর্টেমের টেবিল থেকে খালাস

পাওয়া মাল। মুচি ডেকে সেলাই করাতে হবে। পেন্সিলের পেছন দিয়ে ভুরুর কাছে টোকা মারতে মারতে বললেন, কী দিয়ে শুরু করব? বড় হোটেলের ফিফটি সিকস কোর্স লাঞ্চ শুরু করার আগের প্রশ্ন। দুর্বলতা দিয়ে স্টার্ট করুন। রোজ রিকশা আর মিনিবাসে দেউলে করে দেবার জোগাড় করেছে। এক পা হাঁটলেই হার্ট—ও হ্যাঁ, হার্টটা একটু নোট করে নিন, মিনিটে একটা করে বিট মিস করছে।

নিভে যাওয়া চুরুটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন, আমি বলি কি আপনি হসপিটালাইজড হয়ে যান। আমি লিখে দিচ্ছি। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হসপিটাল! পাগল হয়েছেন, হাসপাতালে কোন দুঃখে মরতে যাবো? মরি যদি সেও ভাল, আমার নিজের খাটই ভাল। কাকাবাবুর দুর্দশা দেখিনি! তিন তারিখে বেডপ্যান চেয়ে সাত তারিখে পেয়েছিলেন। তাও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সাত পাতার করুণ আবেদন জানিয়ে। আর পারছি না স্যার। একবার ছ নম্বর বেডের ইনজেকসান তাকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই ওষুধ আবার মুরগি দিয়ে 'সাক' করিয়ে বের করে আনতে হয়েছিল। ইছাপুর থেকে রোজা আনিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে সেই সাপের বিষ নামাতে হল। রোজ রাতে পেল্লায় পেল্লায় ইঁদুরের পেছনে সারা ওয়ার্ডে দৌড়ে বেড়াতেন। এই বিস্কুটের প্যাকেট কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে, কখনো কড়াপাক সন্দেশের বাক্স, কখনো পাউন্ড রুটি। একবার বালিশের তলা থেকে একশো টাকার দুটো নোট নিয়ে গুরুভোজন করেছিল। ছ জোড়া চটি চুরি হবার পর সপ্তম জোড়াটা রাতে বালিশের তলায় নিয়ে ঘুমোতেন। আর বেশ বড়দরের রুগী এলে রোজই তাঁকে ধরাধরি করে বাথরুমের দরজার সামনে ফেলে দিয়ে আসত যতক্ষণ না সেই ভি. আই. পি পেসেন্ট বেড থেকে কেবিনে উঠছেন। তিনবার ডেথ লিস্টে নাম উঠেছিল। একবার আমরা মর্গ থেকে উদ্ধার করে এনে গরম চাটুতে সেঁকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলুম। সেই হাসপাতালে আপনি আমাকে পাঠাতে চাইছেন! ও আমার নিঠুর দরদী!

ডক্টর চৌধুরী বেশ বিপাকে পড়েছেন মনে হল। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। আমি কী করিতে পারি! ডাক্তারের সঙ্গে লুকো-

র চলে না। সব খোলাখুলি। মহিলারা পর্যন্ত নিষ্কৃতি পান। চাকরিতে ঢোকার আগে মেডিকেল টেস্টের কথা আজও ভুলতে পেরেছি কি ! পাঁচটা টাকা পকেটে ছিল না বলে বৃদ্ধ ডাক্তার লাইনে দাঁড় করিয়ে সকলের সামনে সেই তরুণ বয়সে পোস্ট বক্স খুলে—

তাহলে একটা টনিক লিখে দি। সপ্তাহ খানেক খেয়ে দেখুন। সঙ্গে একটা করে ভিটামিন ক্যাপসুল থাক। প্রেসক্রিপশানের প্যাড টেনে নিলেন ডাক্তারবাবু। টনিক আর ভিটামিন তো নিজেই নিজেকে করতে পারতুম। এর জন্যে বত্রিশ টাকা খরচের কী দরকার ছিল। এর সঙ্গে চার যোগ করলে এক সপ্তাহের রেশন। টনিক প্লাস ভিটামিন প্রেসক্রাইব এক মাসের পথ খরচ। আমার আপাত্তটা প্রকাশ করেই ফেললুম, রোগের কারণটা জিইয়ে রেখে ফুটো পাত্রে টনিক আর ভিটামিন ঢেলে লাভ কী ?

তাহলে ডু ওয়ান থিং, কাল সকালে খালি পেটে চলে আসুন, ব্লাডটা নি, আর ফাস্ট ইউরিন একশিশি, এক ফোঁটা স্টুলও নিয়ে আসবেন, টেস্ট করে প্রেসক্রিপশান করব। তার আগে নয়। আদালতে যেন দিন পড়লো। উকিল আর ডাক্তার টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। ব্লাড বের করে নিয়েই বেরোবে। আর ডাক্তাররা তো সাধারণত আমাদের মত পুওর পেশেন্টদের চোখে ড্রাকুলার মত। সমস্যা দ্বিতীয় আর তৃতীয় বস্তু নিয়ে। ও দুটি বস্তু তো আমার আজ্ঞাবহ নয়। একমাত্র উপায় পুলিশের রুলের তলপেটে গুঁতো। ডাক্তার বললেন টেস্ট ছাড়া নো ট্রিটমেন্ট। আমি ডক্টর চৌধুরী, নট ঘোষাল। ঘোষাল যা পারে আমি তা পারি না।

ডক্টর চৌধুরী ফি না নিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি প্রকৃত ডাক্তার নন। ডক্টর শার্ক নন। আপনি তো আবার আসছেন তখন দেবেন। বাসে দশ টাকা দিয়ে কুড়ি পয়সা টিকিট কাটতে চাইবার অভিজ্ঞতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ডক্টর চৌধুরীরও উঠে দাঁড়িয়েছেন, বোধহয় গলাধাক্কা দেবেন। পেছু হটতে হটতে বেরিয়ে যাব কিনা ভাবছি। চৌধুরী খুব বিনীতভাবে বললেন, আপনার তো যোগের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ আছে। যোগে ড্রাগ অ্যাডিকসানের কোন কিওর আছে ?

হঠাৎ আমি রোগী থেকে ডাক্তার হয়ে গেলাম। যোগ, জ্যোতিষ,

অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান আমি ততটুকুই অধিকার করি, যতটুকু আমার নিজের জন্য প্রয়োজন। নিজে ড্রাগসের ড-ও জিভে ছুঁইয়ে দেখিনি। আমার অ্যাডভাইস চায়। ডাক্তারকে ভরসা দিয়ে বললুম নিশ্চয় আছে। জেনে জানিয়ে যাবো। ডাক্তার চৌধুরী বললেন, মিউচ্যুয়াল, কেমন? আমি ফ্রিতে আপনার চিকিৎসা করব। একটু দাঁড়ান। ড্রয়ার খুলে এক গাদা ফ্রি স্যাম্পল বের করলেন। ভিটামিন, অ্যান্টাসিড, ল্যাকজেটিভ এনজাইম টনিক। সব আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ওষুধ আপনাকে খুব কমই কিনতে হবে। তবে ওই টেস্টের জন্যে যা লাগবে দিতে হবে। দেখি আপনার জন্যে কী করতে পারি। রেশনের চাল থেকে কাঁকর বাছার ধৈর্যে আপনার ট্রিটমেন্ট করতে হবে।

পকেট-ভর্তি ওষুধ, অভঙ্গ একটি নোট, ইনট্যাক্ট সমস্ত অসুখ নিয়ে আমিও কী করতে পারি বলে সুইং দরজা দুলিয়ে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ব্যয়ও হল না আরামও জুটলো না। শরীরের সমস্ত অসুখ পোড়ো বাড়ির মত হো হো করে উঠল—ওই দেখ বেটা যাচ্ছে। যাকে ডাক্তারেও ছোঁয় না।

বড়ি ও শ্বশুরমশাই

'এই শীতকাল, এমন মিঠে রোদ, একটু বড়ি-টড়ি তো দিতে পার।' ডাল দিয়ে ভাত চটকাতে চটকাতে অসীম ব্যাজার ব্যাজার মুখে কথা ক'টা স্ত্রীকে মিহি ক'রে বললে। হুকুম-টুকুম নয়। একটা সামান্য অভিলাষ। এইটুকু বলে থেমে থাকলে ক্ষতি ছিল না। সে আর একটু এগিয়েই বিপদ ডেকে আনল। 'মা-ও গেছেন খাবার বারোটাও বেজে গেছে।'

মনোরমা মাথা নীচু করে সরষের তেল দিয়ে আলুভাতে মাখছিল। মুখ না তুলেই বললে, রাখো রাখো, মা যে তোমাকে রোজ পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়াতেন তা আমার দেখা আছে। মরা মানুষটাকে নিয়ে আর টানাটানি কোর না।'

'হ্যাঁ, মায়ের কথা বললেই তো তোমার গায়ে জ্বালা ধরবে। সেই লাস্ট নাইনটিন সেভেনটি সেভেনে একবার নারকোল, ছোলা-টোলা দিয়ে মোচা হয়েছিল, সেভেনটি ফাইভে হয়েছিল থোড়। তারপর থেকে লাগাতার চলছে, ভাত, ডাল, আলুভাতে, মাছের ঝাল ; মাছের ঝোল, আলুভাতে, ভাত ডাল। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।'

'আমারও।'

'হ্যাঁ আমার যা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমারই তাই হবে। শুধু হবে না, ডবল ডোজে হবে। বেশ কৌশল শিখেছ। তোমার ঘেন্না ধরার কারণটা কি ?'

'কেঁচো খুঁড়তে যেও না, সাপ বেরোবে। খাচ্ছ খেয়ে যাও। মোচা, নারকোল, থোড় না নিয়ে এলে আমি কি জন্ম দেবো?' ধপাস করে আলুভাতের একটা টেনিস বল পাতে ফেলে দিয়ে মনোরমা উঠে গেল। রান্নাঘরে গনগনে উনুনে মাছ ভাজা হচ্ছে। সাঁড়াশি দিয়ে কড়াটা উনুন থেকে উপড়ে নিয়ে এল। গরম তেলে মাছ বিজবিজ করছে মনোরমার মেজাজের মত। একবার যদি সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া দুম করে মেঝেতে পড়ে মনোরমার ঠোঁট ফসকে বেরোনো বাক্যের চেয়েও অসীম আহত হবে। বড়ো ভয় পায় এই মুহূর্তকে। মনোরমা থালার সামনে উবু হয়ে বসে ভীত অসীমের পাতে একটা চারাপোনা ফেলে দিল। ন্যাজের দিকটা নুনের ওপর গিয়ে পড়ল। ভয় কেটে গেছে। এতক্ষণ আগের কথার যে উত্তরটা মনে মনে মকশ করছিল তা বলা যেতে পারে।

'গর্ভে মোচা ধারণ করতে গেলে কলা গাছের বীজ চাই, সে কথা আমি জানি; কিন্তু ওই তিন বস্তু বাজারের ঝোলা থেকে বেরোলে তোমার মুখ তো তোলা হাঁড়ির মত হবে। এ তো আর তোমার ড্রেসিং নয়। ঘাড়ে পাউডার, ভুরুতে পেনসিল, কপালে কুমকুম। মোচা ড্রেস করার একটা আলাদা আর্ট আছে। সে আমার মা জানতেন।'

কড়াটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মনোরমা বললে, 'হ্যাঁ, তোমার মা সব জানতেন। কবিরাজের মেয়ে ছিলেন তো। শেকড়-বাকড়, পাতা-মাতা, কচু-ঘেঁচু।'

'আর তুমি হলে অ্যালোপ্যাথের মেয়ে: মাছ, মাংস, লিভার, পিলে।'

'আমি কার মেয়ে সে তো ভাল করেই জানো। অত ঠেস দিয়ে কথা বলার কি আছে? ডাক্তারের মেয়ে হলে তোমার মত মোচাখেকোর গলায় কি আর মালা দিতুম! টাকার জোরে ব্যারিস্টার জুটতো।'

অসীম হেসে ফেলল। দুজনের ঝগড়া এইভাবেই শুরু হয়ে হাসিতে শেষ হয়। মনোরমা বড়ো ভাল মেয়ে। একা সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে। সহজ সরল মেয়ে। বেশি খাটতে চায় না

বলে অসীম সাবেক কালের খাবার ফ্যাচাং বাড়িতে ঢোকাতে চায় না, আবার সুযোগ পেলে বলতেও ছাড়ে না।

অসীম অফিসে চলে গেল। মনোরমা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ঠিক করে ফেললে, যা থাকে বরাতে, আজ সে সারা দুপুর বসে বসে বড়ি দেবে। কি এমন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার। ডাল বেটে, নুন দিয়ে ফেটিয়ে একটা সাদা কাপড়ের ওপর টুকুস টুকুস করে পেড়ে যাওয়া। সমস্যা নাক নিয়ে। নাক উঁচু উঁচু না হলে বড়ি দেখে নাক-উঁচু মানুষের মন ভরে না। থ্যাবড়া-নাকী মেয়ে যেমন বিয়ের বাজারে অচল, চ্যাপ্টা নাক বড়িও তেমনি সমঝদারের সমালোচনার বস্তু।

শঙ্করীর মা বাড়িতে কাজ করে। সেই হ'ল মনোরমার উপদেষ্টা। উপদেষ্টা বললে, 'আজ তো হবে না মা। ও রাতের বেলা ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে বাটতে হবে। তুমি আজ ভিজিয়ে রেখো, কাল সকালে আমি বেটে দোব।' কাল মানে রবিবার। সেই ভাল। রবিবার ছুটির দিন। অসীমের সাহায্যও পাওয়া যাবে।

রবিবার বেলা একটা নাগাদ ডালবাটা রেডি হয়ে গেল। কালো জিরে ভাজছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ। এইবার শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ডুরে শাড়ি পরে মনোরমা ছাদে বসে বড়ি দেবে।

'তোমার এই ধুতিটা নিচ্ছি।'

অসীম লাফিয়ে উঠল, 'কেন? আমার ওই সাধের নতুন ধুতিটা তোমার কোন কম্মে লাগবে?'

'বড়ি দোব।'

'বড়ি দেবে আমার ধুতিতে? মামার বাড়ি! নিজের শাড়িতে দাও।'

'আটপৌরে নতুন শাড়ি নেই। তোলা শাড়ি একটা দেড়শো-দুশো টাকা দাম। সোনার বড়ি হলে দেওয়া যেত। ডালের বড়ি কি ফুলভয়েলে দেওয়া যায়?'

'তাহলে বিছানার চাদরে।'

'চাদরে? অপবিত্র জিনিস। তোমার কোনও ভয় নেই। বড়ি খুলে নিয়ে কেচে দোব, ইস্তিরি করে নিলেই যেমন নতুন তেমনি

নতুন। ধুতিটা তো পড়েই থাকে। তুমি তো প্যান্ট আর পাজামা পরেই সারা জীবন কাটালে।'

রাজি না হয়ে উপায় কি! বড়ির হুজুক সে-ই তুলেছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ সার সার বড়ি অসীমের কাঁচি ধুতির ওপর থেবড়ে থেবড়ে বসে গেল। তেমন টিকোলো নাক সবক'টার হল না। শঙ্করীর মা জ্ঞান দিলে, 'ভগবানের সৃষ্টিতেই মা কত খুঁত। মানুষের হাতে সব কি সমান হয়। পাড়া বড়ির নাক ধরে আর টানাটানি করুনি! জন্মের পর মানুষেরই আর কিছু করা যায় না। এ তো ডালের বড়ি।'

বড়ির পুংলিঙ্গ বড়া। কিছু বড়া হল, কিছু বড়ি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। মনোরমা এসে অসীমকে বললে, 'এই যে মশাই। তোমার কাগজপত্র নিয়ে ছাদে উঠে যাও। ইজিচেয়ার পেতে বসে বসে পড় আর বড়ি পাহারা দাও।'

'যথা আজ্ঞা।' ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে অসীম কাগজ পড়ছে। কিছু দূরেই কাপড়ে সত্যাগ্রহীর মত বসে আছে সার সার বড়ি। মিঠে রোদ, মিষ্টি হাওয়া, পাখির ডাক কেমন যেন ঘুম এসে যাচ্ছে, চোখ জুড়ে আসছে। দু' একটা কাক মাঝে মাঝে পাশে হেঁটে হেঁটে খরখর করে বড়ি ঠোকরাতে আসছে।

অসীম হুস করলেই উড়ে পালাচ্ছে। এ এক ভাল জ্বালা যা হোক। একেই কি বলে, যমে-মানুষে টানাটানি। কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়! অসীমের চোখ বুজতে বুজতে বুজেই গেল।

মনোরমার চিৎকারে অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। 'এ কি? আমার বড়ি কোথায়?' মনোরমার হাতে বিকেলের চা। অসীম চোখ মেলে দেখলে ফাঁকা ছাদ। কোথাও বড়ির নামগন্ধ নেই।

'তুমি তুলে নিয়ে গেছ।'

'তুলে নিয়ে যাব কি? ভাল করে শুকনোই হল না।'

'ভৌতিক ব্যাপার তো? আচ্ছা রসিকতা! আর কেউ এসেছিল?'

'কে আবার আসবে? তোমাকে পাহারায় রেখে গেলুম তাহলে কি জন্যে?'

'কাকের তো এত ক্ষমতা হবে না? দশহাত ধুতি ঠোঁটে করে নিয়ে পালাবে।'

'পারে, ওরা সব পারে। এক সঙ্গে একশো কাক ঠোঁটে করে নিয়ে উড়তে···।' মনোরমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'ওই দেখ? আমগাছের ডালে ওটা কি ঝুলছে।'

অসীম আমগাছের মগডালের দিকে তাকাল, সাদা একটা কাপড় ঝুলছে।

'হ্যাঁ, ওই তো তোমার বড়ি। ওই তো আমার সেই নতুন কাপড়। ওখানে গেল কি করে?' হঠাৎ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পাতার আড়ালে তিনি বসেছিলেন ন্যাজ ঝুলিয়ে। কাপড় সমেত এ ডাল থেকে ও ডালে লাফ মারলেন, হুপ করে।

'আরে এ তো সেই বীর হনুমানটা।'

'আমার কাপড়? সর্বনাশ হয়ে গেল মনোরমা। টেনে টেনে ফর্দাফাঁই করে দিলে।'

'আমার বড়ি? আমার এতক্ষণের পরিশ্রম। মুখপোড়া হনুমানে খেয়ে নিলে! কার জন্যে বড়ি দিলুম আর কার ভোগে গেল!'

'একছড়া কলা আনো, কলা। কাপড়টা অন্তত উদ্ধার করি।'

'কলা কোথায় পাব?'

'তাহলে?' তাহলে, দু'জনে ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সাধ্য-সাধনা করলে। 'হে বাবা রামের বাহন! হে পবনপুত। হে বাবা গান্ধীজীর চেলা। হে ভগবান হনুমান।' হনুমানের কোনও সুমতি দেখা গেল না। অসীম রেগে গিয়ে বলল, 'ঠিক আমার শ্বশুরমশায়ের মত একগুঁয়ে।'

'অ্যাঁ, কি বললে?'

'তখন তোমাকে কি বলেছিলুম? কাপড়ে দিও না। কাপড়ে দিও না। শুনলে?'

'কে বড়ি বড়ি করে লাফিয়েছিল?'

'ওই যে আমার শ্বশুরমশাই কাঁচি ধুতি পরে খাচ্ছেন।'

আবার ভীষণ ঝটাপটি হয়ে গেল দু'জনে। আর সেই ছেঁড়া ছেঁড়া ধুতিটা আমগাছের ডালে ঝুলে রইল একটা সিজন ধর্ম-ঠাকুরের নিশান হয়ে।

লেপ

বিনয় বিয়ে করে তিনটে বাঁশ পেয়েছে। একটা জ্যান্ত। সেটি হল তার বউ। অন্য দুটি হল ঘড়ি আর লেপ। আমার কথা নয়। স্বয়ং বিনয়ের স্বীকারোক্তি। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর বিনয় চুপচাপ ছিল। না খুশি, না অখুশি, একটা তুরীয় অবস্থা। যত দিন যাচ্ছে বিনয় নীরব থেকে সরব হয়ে এখন রবরবা। কথায় কথায় সংসারের কথা আসবেই। শুরু হবে বউকে দিয়ে। বউ থেকে সেই ভদ্রমহিলার জন্মদাতায়। সেখান থেকে ঘড়ি। ঘড়ি থেকে লেপ। ঘড়িটাকে বিদায় করেছে। কব্জির কাছে ব্যান্ডের সাদা মত গোল দাগ এখনও রঙ ধরে মিলিয়ে আসেনি। মেলাবার মুখে। বউ চিরকালের জিনিস। ঘাড় থেকে নামাবার উপায় নেই, জিয়ার্ডিয়া অ্যামিবায়োসিসের মত ক্রনিক কেস। সারা জীবন ভোগাবে। আর লেপ! শীতে নামাতেই হবে। নামালেই দুজনে গায়ে দেবে। এবং পরের দিন সকালে আমাদের সেই লেপকেচ্ছা শুনতেই হবে।

বিবাহ মানেই একটি বউ এবং মনোরম একটা বিছানা। বিছানা ছাড়া ফুলশয্যা হবে কি করে! বিনয় শীতকালে বিয়ে করেছিল বলে একটি লেপও পেয়েছিল। ডবল মাপ। দুটি প্রাণীর শীতের আশ্রয়। লাল শালুর খোলে শিমুল তুলো। এর মধ্যে সমস্যার কি আছে সরল বুদ্ধিতে বুঝে ওঠা শক্ত। কিন্তু সমস্যা অনেক।

প্রেম যখন ঘনীভূত ছিল তখন সমস্যা ছিল না। আলো

নিবিয়ে লেপের তলায় ঢুকে দুজনে জড়াজড়ি করে 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই' গোছের ব্যাপার। এখন এতদিন পরে অপ্রেমে সেই 'কমান' লেপকে গালাগাল দিলে আমরা শুনব কেন? তবু শুনতে হবে। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হলে সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে পারে, কিন্তু কথায় কথায় একটা আস্ত লেপকে তো দু'টুকরো করা যায় না। কাপড়ও নয় যে জোড়া কেটে দুটো করবে। বউ আর লেপ অবিচ্ছেদ্য। দাম্পত্য প্রেম আবার অবিচ্ছেদ্য নয়। সেখানে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। এই হলায় গলায়, এই চুলোচুলি। তেঁতুল যত পুরনো হয় ততই টক বাড়ে। লেপের ঝগড়া, ঝগড়ার লেপ। লেপের দুই মূর্তি। বউয়ের মতই। এই মনোরম, পর-মুহূর্তেই বিস্ময়। সামলানো দায়।

প্রেমে মানুষ ত্যাগী হয়। বিনয় যখন প্রেমিক ছিল (বছর খানেক মাত্র) তখন শীতে বউকে লেপের তিন চার অংশ ছেড়ে দিয়ে নিজে একের চার অংশে হি হি করত। ছেড়ে দিত বললে ভুল হবে। বউ কেড়ে নিত। প্রথম রাতে লেপের তলায় দুটি মানুষ হলেও প্রেমে তালগোল পাকিয়ে একাকার। তখন আর সমস্যা কি? সমস্যা মাঝরাতে। বিনয়ের আদরে আদুরী বউ উঁমুমু করে পাশ ফিরলেন, লেপের তিনের চার অংশ তার সঙ্গে চলে গেল। বিনয়ের শরীরের আধখানা খোলা, উদোম পড়ে রইল পৌষের শীতে শীতল সাদা চাদরে। পা দুটোকে জড়ো করে স্ত্রীর জোড়া ঠ্যাঙে গুঁজে গরম করতে গেলেই ঘুমের ঘোরে খ্যাঁক করে ওঠে, হচ্ছে কি? এবার ঘুমোও। লেপের বাইরে হায়নার মত মাঝরাতের গাছ-গাছালির শিশির-মাখা শীত হামা দিচ্ছে। বিনয় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পশ্চাদ্দেশটিকে লেপের অংশে ঠেলে দিয়ে ভাবতে থাকে—ঘুমাও, হ্যাঁ এখন ঘুমাও কবি, রাতের কবিতা শেষ। জীবনটা যেন রঙমহলের অভিনয়। প্রেমের নাটকে যবনিকা পড়ে গেছে। নায়িকা পাশ ফিরে লেপের আরামে শুয়ে শুয়ে নায়কে বলছে, দৃশ্য শেষ, মনের মেকআপ তুলে ফেলেছি। তখন তোমাকে সহ্য করেছি, কারণ করতেই হবে। তোমাকে বিশেষ অঙ্কের বিশেষ দৃশ্যে সহ্য করাই আমার জীবিকা। আমার জীবনের দুটো দিক, একটা অভিনয়ের দিক আর একটা নিজস্ব দিক। শীতের

নির্জনতায় মানুষের মনে স্যাতসেঁতে চিন্তাই আসে। মনমরা চিন্তা সব হিলহিল করে ওঠে। পায়ের পাতা দুটোই বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওই জন্যেই বলে শীত করে। করে মানে, হাতে। শীত পায়। পায় মানে পায়ে, পদে। পা দুটো আশ্রয় খুঁজেছিল! পদাঘাতে ফিরিয়ে দিলে! একটা হাত বুকের উষ্ণতায় গরম হতে চেয়েছিল, খুব বিরক্ত হয়ে বললে, মাঝরাতে কি ইয়ার্কি হচ্ছে! সাবাস বেটা। ঘুমোলে মানুষের মনের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। বউ বলে আমিই এক বুরবাক, হেদিয়ে মরি। আসলে তুমি শ্বশুরমশাইয়ের কন্যা। পাকা বাঁশ কি সহজে নোয়রে বাবা!

সামান্য লেপ থেকে বিনয়ের অভিমান বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় উঠল যেখানে বিনয় যৌবনে যোগিনী। কার বউ? কিসের সংসার? বউও শ্বশুরমশাইয়ের, লেপটাও তাঁর। যাও তোমার লেপ তুমিই নিয়ে শুয়ে থাক। বিনয়কে শুধরে দেবার কেউ নেই। শ্বশুরমশাইয়ের বউ কি করে? ওই হল আর কি।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে লেপ সরে যেতেই পারে, তা নিয়ে অত মান-অভিমানের কি আছে বাপ! তুমিও টেনে নাও না। এ তো পাক-ভারত লড়াই নয় যে বাউণ্ডারি কমিশন বসিয়ে সীমানা ঠিক করে দিতে হবে। বিনয় বললে, বউকে নিজের মনে করতে পারলে সে অধিকার অবশ্যই খাটাতুম।

এ আবার কি কথা! বউ নিজের নয় তো পরের?

বিনয়ের উত্তর শুনে ঠাণ্ডা মেরে যেতে হয়! চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন। চব্বিশ ঘণ্টায় দশ ঘণ্টা নিদ্রা। বাকি রইল চৌদ্দ ঘণ্টা। চৌদ্দ ঘণ্টার চার ঘণ্টা চান, খাওয়া, এটা ওটা। বাকি দশ ঘণ্টার সবটাই বিনয়ের খরচ করতে হয় জীবিকার সংগ্রামে। খুব ভাল হিসেব। তাহলে বউয়ের সঙ্গে এত ঠোকাঠুকি, মান-অভিমানের সময় আসে কোথা থেকে। তুমি শ্রীকৃষ্ণ নও, তোমার বউ রাধিকা ঠাকরুনও নন যে সারাদিন কদমতলায় বসে মানভঞ্জন পালা গাইবে। আধুনিক মানুষ, তুমি খাবে-দাবে, ছোটাছুটি করবে, কেরিয়ার গুছোবে, তা না দিবারাত্র বউ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান, লেপ নিয়ে লাঠালাঠি! এই সব পানসে সমস্যা আমরা শুনতে

চাই না। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সমস্যা আছে যা নিয়ে মাথা ঘামালে দেশের উপকার হবে।

বিনয় তখনকার মত চুপ করলেও আবার সরব হয়ে ওঠে। লেপের যে এত মহিমা কে জানত। বিনয় ক্রমশ দার্শনিক হয়ে উঠছে। বিনয়ের মতে, বউ পরের ঘর থেকে আসে আসুক, তার সঙ্গে খাট, বিছানা, বালিশ আর সাটিনে মোড়া একটি লেপ যেন না আসে। খাল কেটে কুমির এনেছ সেই যথেষ্ট, সেই সামলাতেই তোমার হাড়ে দুব্বো গজাবে, সঙ্গে আর কয়েকটা ফালতু লেজুড় এনে ন্যাজে গোবরে হওয়াটা ডবল মুখ্যুমি। পরের সোনা দিও না কানে, কান যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে। হীনমন্যতায় ভুগবে। একই কক্ষপথে দুটো গ্রহ যদি বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে প্রথমেই যা হবে তা হল দমাস করে একটি সংঘর্ষ। তারপর দুটোতে গায়ে গা লাগিয়ে ঠেলাঠেলি। তারপর যার শক্তি বেশি সে-ই ঘোরাতে থাকবে নাকে দড়ি দিয়ে চোখবাঁধা কলুর বলদের মত। সংসারে স্ত্রী জাতিই প্রবলা। প্রবলা হবার কারণ পুরুষ জাতির দুর্বলতা। আমার মানু, মানু আমার করে ফার্স্ট ইয়ারে যে সোহাগ করেছিলে সেই সোহাগের পথে তোমার পার্সোন্যালিটি লিক করে বেরিয়ে গেছে। ফলে সেকেণ্ড ইয়ার থেকেই তুমি ক্রীতদাস। ট্যাঁকে নবজাতক, ঘাড়ে সিংহজাতক।

সিংহজাতক মানে?

শ্বশুরমশাইয়ের নাম নরেন সিংহ। এটা ট্যাঁ করে তো ওটা গর্জন করে। দুজনেরই সমান সমান বায়না। বায়না না মিটলেই এর ক্রন্দন, ওর আস্ফালন, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আমার ধোপা-নাপিত বন্ধ। পিরিতের তাসের ঘর হুড়হুড় করে ভেঙে পড়ল। প্রেম যে কত ঠুনকো তা বিয়ে না করলে বোঝে কার বাপের সাধ্য।

প্রেম ঠুনকো হোক ক্ষতি নেই। তুমিও প্রেমের বয়স পেরিয়ে এসেছ। এখন তুমি পিতা এবং স্বামী। সেই ভাবে বুঝে-সুঝে গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার করে যাও। ঘ্যানর ঘ্যানর করে লাভ কি? শাস্ত্র বলছে 'দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' এই ভাব, এই ঝগড়া। সংসারের জীবন-নৌকো চলবে ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে। উঠবে পড়বে। পড়বে উঠবে।

উপদেশ দেওয়া সহজ। পড়তে আমার মত অবস্থায়, ঠ্যালার নাম বাবাজীবন। শুনবে কি জিনিস! তখনও গা থেকে গায়ে-হলুদের রঙ ওঠেনি, পাওনা শাড়ির মাড় ওঠেনি, লেপের তলা থেকে বলে উঠলেন, বাবা একটা দিয়েছে বটে, পালকের মত হালকা, উনুনের মত গরম। নজর দেখেছ? আমি বললুম, ও তোমার যৌবনের উত্তাপ। তায় আবার পান খেয়েছ কাঁচা সুপুরি দিয়ে। লেপের আবার ভাল-মন্দ কি! সেই এক সালু কি সাটিন, ভেতরে তুলো। সব লেপেই যা থাকে এর মধ্যেও সেই একই মাল। সিংহকন্যা গর্জন করে উঠলেন, রাখো! বরের লেপে শ্মশানের তুলো ভরে দেয়, বুঝলে চাঁদু?

শ্মশানের তুলো? সে আবার কি।

কি জানো তুমি? শ্মশানের যত মড়া আসে তাদের বিছানা ছিঁড়ে তুলো বের করে তুলোপট্টিতে জলের দরে বিক্রি হয়। সেই তুলো দিয়ে তৈরি হয় ফুলশয্যার লেপ। এ জিনিস সে জিনিস নয়। এ হল এক নম্বর মাল। আগুন ছুটছে।

আমি থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, তোমার পিতাঠাকুর কি চৈত্র মাসে শিমুল গাছের তলায় গিয়ে হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে-ছিলেন? পাকা তুলো ফাটছে আর তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে ধরছেন, খোলে পুরছেন। আহা, এ মণিহার আমায় নাহি···। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ। ফ্যাঁসোর ফোঁসোর। তুমি আমার বাবাকে শিমুল-তলায় দাঁড় করালে এরপর কোন দিন বাবলাগাছে চড়াবে। অনেক সাধ্যসাধনা করে শেষে রাত তিনটের সময় দেহি পদপল্লবমুদারম্ আওড়াতে আওড়াতে স্বামীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ভোরবেলা শুকনো মুখে, বসা চোখে কাকের ডাক শুনতে শুনতে মনে মনে বললুম, ইহা লেপ নহে, যীশুখ্রীস্টের মৃতদেহের সেই আচ্ছাদন।

শ্বশুরবাড়ির জিনিস সম্পর্কে সব মেয়েরই ওই রকমের এক ধরনের দুর্বলতা থাকে। বউ বস্তুটিকে ব্যবহার করার কায়দা আছে ভাই। মোলায়েম হাতের ময়দা ডলার মত ময়ান দিয়ে মাখতে হয়, তবেই না খাসা মুচমুচে লুচি।

তা হলে শোন। সেই লেপপর্ব কোথাকার জলকে কোথায় নিয়ে গেছে। লেপের তলায় ঢুকে একদিন পা দুটোকে বেশ একটু

খেলাচ্ছ। সিংহকন্যা বললে, হঠাৎ আবার দেয়লা শুরু করলে কেন? সাতজন্মে পা ঘষ না। তোমার ওই চাষাড়ে পায়ের ঘষা লেগে লেপের ছাল উঠে যাবে।

কথাটা কিছু অসত্য বলেনি হে। তোমার পায়ের যা মাপ আর তার যা চেহারা। অনেকটা এবমিনেবল স্নোম্যানের মত।

পুরুষের পা এই রকমই হয়। পদাঘাতের পা। আঘাতের লোক তো আর পেলুম না, পদাঘাত খেয়েই গেলুম। আমার বরাতে নিউমোনিয়ায় মৃত্যুই লেখা আছে।

কেন?

কেন আবার! এই শীতে রোজ রাতে বিছানায় ওঠার আগে কনকনে ঠাণ্ডা জলে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে লেডি ইন্সপেক্টার জেনারেল-কে দেখিয়ে অনুমতি নিয়ে বিছানায় উঠতে হবে। তারপর শুনবে, আরও শুনবে বিনয়ের বিনীত কাহিনী। পেঁয়াজ কি রসুন কাঁচা খাওয়া চলবে না। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে লেপের ভেতরের হাওয়াতে ভেসে বেড়াবে। মুলো খাওয়া চলবে না। পেট গরম হতে পারে। গরম পেটঅলা লোক নিয়ে কমান লেপে শোয়া যায় না। রোজ টকদই খেতে হবে। ঠাণ্ডাজলে সাবান মেখে চান করতে হবে। শরীরের সন্ধিতে সন্ধিতে ছোবড়া ঘষতে হবে। নিম্ন বাহুতে গোলাপের নির্যাস মাখতে হবে। পরিষ্কার ধবধবে পাজামা আর গেঞ্জি পরতে হবে। কারণ লেপের তলায় চাই কলগেট নিশ্বাস বাগিচার সুগন্ধ। লেপের তলায় নেড়িকুকুর নিয়ে কোন ফ্যাশা-নেব্‌ল মহিলা শুতে পারেন না। লোমঅলা, ধবধবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাউডার মাখা বিলিতি কুকুর চাই। মাথায় তেল মেখে কলুর বলদ হওয়া চলবে না। তেলচিটে বালিশ, তার ওপর সাটিনের লেপ, ম্যাগো, ভাবা যায় না! এবম্বিধ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তোমরাই বল?

বউকে পারবে না, লেপটাকেই ডিভোর্স কর। সিংহশাবককে বল, খুব হয়েছে মা জননী, তুমি থাক মহাসুখে লেপের তলায়, আমি থাকি আমার মত কাঁথার তলায়। শীতকালে প্যাঁজ না, রসুন না, মুলো না, মাথায় তেল নয়। মামার বাড়ি আর কি! রোজ চান? এমন অনেকে আছেন যাঁরা শরতে শেষ চান করেন,

শীত পার করে ফাল্গুনের হোলিতে রঙিন হয়ে আবার চানপর্ব শুরু করেন। তোমার যদি হাঁপানির ব্যামো থাকত, তোমার বউ কি করতেন—তালাক দিতেন?

আরও একটা দুঃখের কথা বলি ভাই, ফুলকপি আমার ভীষণ প্রিয়। সারাবছর অপেক্ষায় থাকি, শীত এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব বলে। সেই কপি খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। কপি বায়ুকারক। আমার স্ত্রী বলে, লেপের যোগ্য হবার চেষ্টা কর। যা তা মাল লেপে সিঁধোলে পলিউশান হবে।

মার শালা তোর শ্বশুরবাড়ির লেপে এক লাথি।

তাই তো মেরেছি। আগে আগে হত কি, সন্ধেবেলাই হিসেব নিয়ে বসতুম। অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতে বউকে অর্থনীতির উপদেশ দিতে ইচ্ছে হত। আয় বুঝে ব্যয় করতে শেখ! কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। তেলটাকে সেই তিন কিলো-তেই তুললে। কয়লা দু মণেই তাহলে পাকা হয়ে গেল! রোজ এক কেজি আলু লাগবেই! পাঁচ কেজি মুগের ডাল? লম্বে হাত। মাসে গায়ে মাখা সাবান পাঁচটা? বহুত আচ্ছা। ঠুস ঠাস, ঠুস ঠাস করতে করতে পর্বত ধূমাৎ বহ্নিমান। টুক করে বলে বসল, এবার থেকে তুমিই তাহলে রাঁধ। শীতকালে তেল একটু বেশিই খাবে।

না, খাবে বললেই খাবে। একটু টানতে শেখ, কেবল ছাড়তেই শিখেছ।

আমার বাপের বাড়িতে এত টানাটানি ছিল না। হা-ঘরের মত সংসার আমি করতে পারব না।

ডোন্ট ফরগেট, দিস ইজ নট ইওর বাপের বাড়ি। শ্বশুরের তেল বেচা পয়সা আহ্লাদী মেয়ে দু'হাতে উড়িয়েছেন। দীয়তাং ভুজ্যতাংয়ের কাল চলে গেছে। ব্যস, সিংহী অমনি ফুঁসে উঠে তাঁর চাল চালতে লাগলেন। রাতে অনশন। শয্যাত্যাগ। ভূতলে শয়ন। সাধ্য-সাধনায় তিনি ভূতল ছেড়ে শয্যাতলে এলেন। ঘাড়ে লেপ চড়ানো হল। রাগ পড়ল না। স্বামী সাংঘাতিক হলেও একটি প্রাণী। মশা কিন্তু আরও ভয়ংকর, আরও রমণীরক্ত লোভী এবং ঝাঁক ঝাঁক। মশার আক্রমণে লেপাশ্রিতা হলেও সন্ধি হয় না। একই লেপের তলায় দুই রাগী। লেপের গরম, রাগের গরম, ঘেমে

মরি। তখন ছিল একদিন ঝগড়া তো পরের দিন ভাব। তিরিশ দিনের পনেরো দিন স্বামী-স্ত্রী আর পনেরো দিন ছোটলোকের বাচ্চা আর ছোটলোকের বেটি। পাশ ফিরে শুয়ে হাপর টানে। পশ্চাদ্দেশ ঠেকলেও জ্বলে জ্বলে ওঠা, ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া। বাঘ কিংবা বিষধর সাপ নিয়ে শুয়ে থাকা।

সে তো ভালই। দাম্পত্যকলহের পর প্রেম আরও জমে ওঠে। মেঘলার পর রোদ, রোদের পর মেঘলা, কনট্রাস্ট না হলে খেল তেমন জমে না ভাই। ঠিক রাস্তাতেই চলেছ গুরু। ঠাকুর বলতেন, রসেবশে রাখিস মা।

হ্যাঁ ভাই, তা ঠিক। সেই রস এখন জমে মিছরির ছুরি হয়ে যেতেও কাটছে আসতেও কাটছে। গত একমাস বাক্যালাপ বন্ধ। আঠারো কেজি চিনির দাম নিদেন একশো আশি টাকা। বেশি মিষ্টি করেই মিষ্টির কথা বলতে গেলুম। একশো আশি টাকার চিনি খেলে আমি যে চিতেয় উঠব ভাই। উত্তর হল, মায়ের পেট-গরমের ধাত, রোজ শরবর খেতে হয়। মেয়ে হয়ে কিছুই করব না, তা তো হয় না। তুমি আর মায়ের মর্ম কি বুঝবে বল। ছেলে-বেলাতেই খেয়ে বসে আছ। মা ছিল বলেই না আমাকে পেয়েছ। তা আমি ভাই একটু ভেঙচি কেটে বলে ফেলেছিলুম, আহা মাতৃভক্ত মাতঙ্গিনী, স্বামীকে শয়ে চাপিয়ে মায়ের দেনা শোধ! কথাটা মুখ ফসকে বেরোনমাত্রই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। কাপ ডিশ ভেঙে, দেরাজের আয়না চুরমার করে, বইয়ের র‍্যাক ভেঙে আধুনিক রাজনীতির কায়দায় অ্যায়সা প্রতিবাদ জানালে, তিনদিন হাঁড়ি চড়ল না। দফতর চালু হলেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। আমি বউবাজার থেকে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড লিখিয়ে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম—রাগ চণ্ডাল। তার তলায় লিখেছি—চণ্ডালের হাতে পড়েছি। তোবা আমাকে একটা লেপ কিনে দে ভাই, ডিসেম্বরের শীতে কেঁপে মরছি।

কেন সেই লেপটা?

ভাই বিছানায় পার্টিসান উঠেছে। একটা রাত শুধু লেপ বয়ে কেটেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। কেঁপে কেঁপে ঘুম আসছে, এসে গেছে, ঝপাত করে গায়ে ভারি মত কি একটা পড়ল।

আচমকা। ভেবেছিলুম বউ হয়তো অনুশোচনায় ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ল। ক'দিন চালাবে বা কোল্ড ওয়ার। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা চলে কি? ওঠ ওঠ! কেন ওরকম কর? বলেই মনে হল, আরে বউ তো আরও একটু শক্ত হবে, লম্বামত হবে। এতো দেখছি অনেকটা জায়গা নিয়ে চৌকো মত কি একটা এসে পড়েছে। বউ নয়, লেপ। কি হল, লেপটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে? উত্তরে মিনি গর্জন শোনা গেল, হুঁ।

তোমার বাবার লেপ তুমি নিয়েই শোও। আমার ঘাড়ে কেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর, লেপ তোমার।

হ্যাঁ, লেপ আমার। তা ঠিক। বউ আর লেপ দুটোই আমার ছিল। আসলটা হাত ছাড়া, ফাউ জড়িয়ে মাঝরাত্রে মটকা মেরে পড়ে থাকি। এ যেন সেই গ্যারেজে গাড়ি রেখে বাবুর বাসে ঝোলা। লেপটা দুহাতে তুলে ঝপাং করে সিংহকন্যার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এলুম। সারারাত লেপ নিয়ে পিংপং। তোরা ভাই আজ আমাকে একটা লেপ কিনে দে।

বেডিং স্টোরে গিয়ে আমাদের লেপ দেখা শুরু হল। দেখি একটা হাল্কা সিঙ্গল লেপ। বিনয় বলল, সিঙ্গল নয় ডবল।

ডবল কি করবি? সিঙ্গল মানুষ!

না, ডবল কিনব। এতকাল শীতের রাতে বউয়ের লেপের তলায় নেড়িকুকুরের মত আশ্রয় খুঁজেছি। এইবার নিজের লেপে বুক চিতিয়ে পাশে একটু জায়গা রেখে শুয়ে থাকব। দেখি তুমি আস কি না, তোমার অহঙ্কারের দরজা খুলে।

শাপে বর

আমার স্ত্রীর নাম স্নিগ্ধা। বেশ ভারিক্কি চালের মহিলা। স্বভাবে মোটেই স্নিগ্ধ নন। নাম উগ্রচণ্ডী হলে বেশ মানাত। যে বয়সে সাধারণত নাম রাখা হয়, সে বয়সে মানুষের স্বভাব প্রকাশ পায় না। সেই কারণেই বোধ হয় নামঘটিত এই মারাত্মক অমিলটি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এই জিনিসটির হাতে জেনেশুনেই আমাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটু টাইট হবার জন্যে। ইঁট চাপা ঘাসের মত আমার জীবন এখন বিবর্ণ। যাক, দুঃখ করে লাভ নেই। কপালে লিখিতং ধাতা কোন শ্না কিং করিষ্যাতি।

এই মুহূর্তে আমার সেই তেজি টাট্টু ঘোড়ার মত স্ত্রী বিছানায় আমার পাশে শুয়ে কোঁক কোঁক শব্দ করছেন। না কুঁকড়ো খেয়ে নয়, জ্বর এসেছে কম্প দিয়ে। অর্থাৎ হাতি এখন পাঁকে পড়েছেন। আমি এক চামচিকি। ইচ্ছে করলে কুতুস করে একটা লাথি মারতে পারি। অতটা অভদ্র নই, তাছাড়া সেরে ওঠার ভয় আছে। এ জিনিস বেশিদিন শয্যাশায়ী থাকবেন না। আমি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারি। তখন আমার এই অপরাধের শাস্তি কি হবে ভেবে আমার সেই প্রবাদোক্ত চিকিচাম হবার সাহস শীতের প্রত্যঙ্গের মত গুটিয়েই রইল।

কপালে হাত রেখে মনে হচ্ছে দুইয়ের কম হবে না, তিনও হতে পারে। এর কম হলে ঠিক মানাবেও না। স্নিগ্ধা এখন খুবই

উত্তপ্ত। ঘাড়ে একটা চাদর চাপিয়েছে, তার ওপর একটা খেস, তার ওপর দুটো পাশ বালিশ। এইবার ওই বিচিত্র কম্বিনেশানকে আমি চেপে ধরি, তেনার শরীরের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেঁপে কেঁপে উঠছি। ধরিত্রী মাতা কেঁপে উঠলে সন্তানেরও তো নিস্তার নেই। সবই রসাতলে যাবার দাখিল।

মাঝে মাঝে কোঁকোর কোঁ থামলে দাঁতের বাদ্য সহযোগে দু' একটি মধুর বাক্য শ্রীমুখ-নিঃসৃত হচ্ছে। জানতুম, জানতুম আমার এই অবস্থাই হবে। যে হাতে পড়েছি! (কে যে কার হাতে পড়েছে!) বাবুরা এমন বাড়ি করলেন নর্দমা দিয়ে জল সরে না। কোঁকোর কোঁ। ভাল করে চেপে ধরতেও পার না, ল্যাদাড়ুস! (স্ত্রীকে চেপে ধরতে পারে, এমন স্বামী কজন আছে!) তার ওপর আবার বাগানের শখ! কোঁকোর কোঁ। বাগান করেছে, বাগান! (দাঁতের বাদ্যি) আফ্রিকার জঙ্গল বানিয়ে বসে আছেন। মশার ঠ্যালায় তিষ্ঠোয় কার বাপের সাধ্যি! আমি জানতুম এই গুল-বাগিচায় আমার ম্যালেরিয়াই হবে। এইবার লিভার বাড়বে, পিলে ফুলবে। গ্যাঁড়গেঁড়ে পেট নিয়ে বাকি জীবনটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে বাবুর গার্ডেন চেয়ারে বসে বসে শোভা দেখি, গাছের শোভা। কোঁকোর কোঁ।

ল অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটির জলজ্যান্ত উদাহরণ। হাতের কাছে যা ছিল, বিছানার চাদর, দরজার পর্দা, কাঁথা কম্বল সবই চাপানো হয়েছে। এক-তলা, দো-তলা অবস্থা। দো-তলার গাড়ি-বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে মুখ ঝুলিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছি, কি বুঝছো! আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোমার মত ফেটে পড়ছেন। আর কিছু চাপাতে পারছ না! হাতের কাছে আর তো কিছু দেখছি না। চাপাতে চাপাতে দেউলে হয়ে গেছি। শেষ একটা জিনিসই চাপানো যেতে পারে, সেটা হল রোড রোলার। রাস্তা মেরামত হচ্ছে। বাইরে দাঁড়িয়ে সেই দৈত্য বিশ্রাম করছে। একমাত্র ওটি চাপালে এটি হয়ত শান্ত হবেন। চির শান্তি। আমার সেই গরম কাপড়ের স্যুটটা পরবে? যেটা পরে আমি লে, না লাদাখ, কোথায় যেন গিয়েছিলুম! কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। (জ্বলবেই তো! পিলে বড় হয়েছে যে। রাত দশটা নাগাদ জ্বর

এসেছে, দু'ঘণ্টা হতে চলল। এতক্ষণে পিলে নিশ্চয়ই ইঞ্চিখানেক বড় হয়েছে। পিলে তো ভারতের অর্থনীতি নয় যে বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করেও বড় হয় না!) ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। ভেবো না, তোমাকেও ধরল বলে।

সে তো ভালই। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। দু'জনে জাপটা-জাপটি করে এক আত্মা, এক প্রাণ, এক দেহ হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে, কোঁ কোঁ করব! দাম্পত্য জীবনের ফাটল ফোটল ম্যালেরিয়ার পলেস্তরায় জোড়া লেগে যাবে।

জ্বরটা একবার দেখ তো। মনে হয়, ছয় কি সাতে উঠেছে!

বাব্বা! মানুষের জ্বর-মাপা যন্ত্রে তো কুলোবে না। স্কেল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ঘোড়ার থার্মোমিটার চাই। ড্রয়ার থেকে থার্মোমিটার বের করে ঝাড়তে থাকি। পারা কি সহজে নামতে চায়! চুরানব্বইতে আটকে বসে আছে। খ্যাচাং খ্যাচাং করে ঝেড়েই চলেছি। হাতের খিল খুলে যাবার দাখিল। নিজের পারাই নেমে গেল, থার্মোমিটারের পারা যেমন তেমনি।

ঠুং করে একটা শব্দ হল। টেবিলের কোণে লেগে যন্ত্রের যন্ত্রণা শেষ। মেঝেতে কাচের কুঁচো। মুক্তোর দানার মত তিন চার দানা পারা কোণের দিকে টল টল করছে। নামতে নামতে একেবারে মেঝেতে গিয়ে নামল।

যাঃ বারোটা বাজালে তো! খাও না খাও কাল সকালেই একটা কিনে আনবে। ওটা রমাদির থার্মোমিটার।

আমাদেরটা কোথায় গেল?

কমলাদি সেবার ছেলের জ্বরের সময় নিয়ে গেল না!

তারপর কি হল?

আর এল না। সেখান থেকে গেল ছন্দাদের বাড়ি। ছন্দা থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে তন্দ্রা···

বুঝেছি, বুঝেছি। ক্রিস্ট্যাল ক্লিয়ার। জরু আর গরুর মতই থার্মোমিটার একবার হাত ছাড়া হলে আর ফিরে আসে না। সকালে ডাক্তারবাবু এসে ডিক্লেয়ার করলেন, জ্বরের গতি-প্রকৃতির দিকে কড়া নজর রাখুন। বিছানায় ফ্ল্যাট করে ফেলে রাখুন। তিনটি অস্ত্র ছেড়ে গেলুম, ম্যালেরিয়া, বিকোলাই আর টাইফায়েড। যেটা

লাগে। এতে যায় ভালই, নয় তো প্রস্তুত থাকুন। দেহনির্যাস টেস্ট করে মাল ছাড়ব।

সেটা তো আগে করলেই হয়।

কি দরকার? দেখাই যাক না দিন দুই।

এইবার শুরু হল রিয়েল খেল। কে রাঁধবে? শব্দময় ঝঙ্কৃত প্রভাতের বদলে এ যেন ভিন্নতর একটি দিন। স্নিগ্ধার হাঁকডাক নয়, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, টুইস টুইস। কি আশ্চর্য। পৃথিবীতে এখনও পাখি ডাকে! ভুলেই গিয়েছিলুম। দেয়াল ঘড়ি চলছে খটাস খটাস শব্দে। একটা বেড়াল ডাকছে করুণ সুরে। কি সুন্দর, মসৃণ, পেলব, প্রসন্ন একটি সকাল। মশারির বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি রুগীর মুখ। জ্বর একটু কম। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আহা। ঘুমোও ঘুমোও। উঠলেই বড়ো শব্দ হবে। শব্দযন্ত্র। খাটের তলায় একটি বাসি আরশোলা কেতরে কেতরে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছে। অন্যদিন সাহস পায় না।

আর দেখছি রান্নাঘরের দরজার সামনে দু' বোতল দুধ হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। কেটলির ওপর ছাঁকনি কার্নিশে ঝুলতে থাকা আত্মহত্যাকারী ব্যর্থ প্রেমিকার মত বাতাসে দুলছে। পাড়িতে পাড়িতে না পাড়ি না পাড়ি। সকালের সংসার অপেক্ষা করে আছে ভিতরটা চা চা করছে।

রান্নাঘরের দরজা খুলতেই ভুস করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে এল দুঃখীর দীর্ঘশ্বাসের মত। অনেক আগেই এ বাতাসের মুক্তির কথা ছিল। আজ সব কিছুই লেটে চলছে। জানালা খুলতেই আলো এল। কোণের দিকে গ্যাস সিলিণ্ডার তাল ঠুকে বললে, আয় চলে আয়, তোকে যমের বাড়ি পাঠাই। বড়ো ভয় পাই ওই লৌহ মুদগরকে, জঠরে যার তরল অগ্নি। ফেটে ফুটে কত যে রেকর্ড করেছে। নারী চরিত্রের মত। বেশ আছে, বেশ আছে, হঠাৎ দুম। সব্যসাচী চলে গেলেন সহমরণে।

গ্যাসের দরকার কি? হবে তো চা, দুধ জ্বাল আর ভাতে ভাত। সাহেবগঞ্জের খাঁটি গব্য টেবিলের ওপর শিশিতে যত দিন যাচ্ছে ততই আরো হলদে হয়ে আরো গরু হচ্ছে কেরোসিন কুকারেই কাজ চালিয়ে দেওয়া যাক। গ্যাসে খোঁচাখুঁচি

না করাই ভাল। টেঁটিয়া স্বভাব। যেমন আছে থাক এক পাশে।

কুকার ঝন ঝন করছে। তেল নেই, বোতল টিন সব খালি। পশ্চিমবঙ্গে কবে যে তলে তলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, কেউ টের পায়নি। থেকে থেকে ব্ল্যাক আউট। মাঝে মধ্যেই শত্রু-পক্ষের অদৃশ্য বিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বোমা ফেলে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট ভেঙে চুরমার। বাস ট্রাম দেখলে মনে হয় লোক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেভাবেই হোক বিধ্বস্ত শহর ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে চাইছে। কেরোসিন তেলের বিশাল বড় লাইন এঁকে বেঁকে পড়ে আছে। মাঝ সমুদ্রে ব্লিৎসক্রিগ চলেছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তেল মিলবে। লাইনে দাঁড়িয়েই মানদার ডেলিভারি হয়ে গেল। ছেলের নাম রেখেছে কেরোসিন কর্মকার। খেলার লাইনের এক্স-পার্টরাই চাকু চড়িয়ে তেলের লাইনে। ধৈর্যে কে হারাবে তাঁদের?

আবার গ্যাসের দ্বারস্থ। ওলটানো শিবলিঙ্গটি স্তোত্রপাঠে সন্তুষ্ট করে হাত লাগাই। কোনটা যে কী, কেমন করে ঘোরায়? রবারের কালেক্টার টিউবে সাবানের ফেনা মাখিয়ে দেখতে হবে নাকি? লিক করছে কি না। সব সমস্যা মিটলেও একটা সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, ভাত প্রায় ফুটে সেদ্ধ হয়ে এসেছে এখন ফ্যান গালার কি হবে! নারীর জীবনে বিবাহ যেমন এক সমস্যা, পুরুষের জীবনে ভাতের ফ্যানস্রাব তেমনি এক সমস্যা। সমস্যার কি আছে? চেষ্টা করে দেখতে কি দোষ! হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দাও। দু দিক থেকে ধরে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়েই টেনিসের ব্যাকহ্যান্ড সার্ভিসের মত উলটে দাও। ঢাকনার মুখ ফাঁক হয়ে সিঁই করে বেরিয়ে এল গরম হাওয়া। তার পরের ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে গেল। সামান্য একটু চিৎকার। হাঁড়ির পতন। প্রদর্শনী নম্বর দুই। প্রথম প্রদর্শনী বিছানায়। দ্বিতীয় প্রদর্শনী, চেয়ারে ঠ্যাং ছড়ানো আমি, হাতে পায়ে হলদে পোড়ার মলম। তোরা কে দেখবি আয়, কদমতলায় পোড়া কৃষ্ণ, রাধিকা বিছানায়।

একেই বলে শাপে বর। জ্বর বেশ জেঁকেই বসল। দিনে তিনবার কেঁপে কেঁপে আসে আর ঘাম দিয়ে ছাড়ে। ধরে আর ছাড়ে। পুলিশের পলিটিক্যাল মস্তান ধরার মত। আত্মীয়স্বজনরা

এগিয়ে এলেন। সংসার চলতে লাগল সার্বজনীন পুজোর কায়দায়। কাকিমার বাড়ি থেকে ভাত, দু'চার পদ তরকারি। পিসিমার বাড়ি থেকে পোস্ত। জ্যাঠাইমার বউমা সম্প্রতি ঘর আলো করে এসেছেন। রন্ধনবিদ্যায় দ্রৌপদী। তাঁর হাতের নানা কেরামতি, সব আসতে লাগল লাইন দিয়ে। যেন রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে। আসছেই আসছে। অড়হর, ডাল, লাউ দিয়ে মুগের ডাল, মাছ, তাড়াহুড়ো, তাই ডিম এসেছে সেদ্ধ। খাবার ঘরে সারি সারি মাল চাপা। ঢাকা খুললেই নানা বিস্ময়। আত্মীয়স্বজনরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। থালার পাশে গোল হয়ে বাটির সারি। সারির পর সারি, একসার, দু'সার। রবিবার তিনসার, চারসার।

ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, একমাস একেবারে চিৎপাত পড়ে থাকুন। কোনও কাজ নয়, স্রেফ ক্যাপসুল খেয়ে যান। আমি যখন বলব গেট আপ, তখনই গেট আপ। তার আগে নয়। কি মজা! সকালে বাজার ছুটতে হচ্ছে না। মাছের ন্যাজ ধরে টানা-টানি করতে হয় না। রাজার মত ঘুম থেকে ওঠো, দাড়ি কামাও, চা খাও, কাগজ ওল্টাও। চান করে বসতে না বসতেই লাইন দিয়ে আসতে লাগল, বাটি, ঘটি, ডেকচি, ডেড়ি ডার্মাড়ি। এই একটা আইটেম আবার শেষ মুহূর্তে উড়তে উড়তে আসে শেষ মুহূর্তের ট্রেনযাত্রীর মত।

চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো। এই বাজারে ঘাড়ে বসে খাওয়া। একদিন দুদিন হলে কথা ছিল না। দিনের পর দিন। একদিন একটা ব্যাগে পাঁচশো আলু, আড়াইশো পটল, দুশো ঢ্যাড়শ, গোটা তিনেক করলা, একটা চালকুমড়ো, এক ডগা পুঁই-শাক, আর এক হাতে একটি প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে ছোট্ট একটি কাতলা মাছ নিয়ে এক রাউন্ড ঘুরে এলুম। প্রথমে পিসিমার বাড়ি। ছি, ছি, বাবা। তুমি এত নীচ! আমাদের এতই দরিদ্র ভাব! এ তো আমাদের কর্তব্য! যাও নিয়ে যাও। আর কখনও মানুষকে এভাবে অপমান কোরো না। পিসতুতো ভাই বললে, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। দেবার আগে এক কাপ চা খাইয়ে দাও।

সেই একই ব্যাগ হাতে কাকিমার বাড়ি। বড়ো মর্মাহত হলুম বাবা। তিনি বেঁচে থাকলে তোমাকে জুতোপেটা করতেন। এক

সময় যৌথ পরিবার ছিল, এখনই না হয় ভেঙে ভেঙে চুরমার। তিনি তোমায় কোলে-পিঠে মানুষ করে গেছেন। আমার ছেলে কি এতই গরিব? তুমি একটা দেড়ছটাকি কাতলা নিয়ে সাত সকালেই আদিখ্যেতা করতে এসেছ! এ সবই হয়েছে তোমার বউয়ের পরামর্শে। পরের মেয়ে এসে এই ভাবেই ঘরের ছেলেকে পর করে দেয়। ঘোর কলি রে বাপ!

আচ্ছা আমি তাহলে আসি, বলে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লুম।

এরপর জ্যাঠাইমা। আমার ব্যবহারে তিনি এতই মর্মাহত হলেন, উপায় থাকলে আত্মহত্যা করতেন। নেহাত সংসারে বাঁধা পড়ে গেছেন। মনটাকে ভীষণ উদার করার পরামর্শ দিলেন, যেমন আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন। তুমি গলায় ব্যাগটি ঝুলিয়ে কেটে পড় এখন। জেনে নিলেন কটায় খেতে বসব। ঠিক নটার সময়।

শীতলাতলায় অনেক দিন একটা সিধে মানসিক করা ছিল। আলু, পটল, ঢ্যাঁড়শ, মাছ পুজারীর হাতে দিয়ে একটি প্রণাম ঠুকে পলায়ন। হিসাব করে দেখলুম স্বার্থের পাল্লা লাভের দিকেই ঝুঁকে আছে। রোজ ওষুধ চলেছে গোটা ছয়েক টাকা। নানা রকম টেস্টফেস্ট গোটা পঞ্চাশ টাকা, ভিজিট গোটা তিরিশ, বাকি সবই তো দাতব্যে চলেছে।

এরপর লাভের ওপর নিট লাভ, স্নিগ্ধা ফ্যাকাশে, পাণ্ডুর মুখে বললে এবারে আমার জন্যে আর পুজোর শাড়ি কিনো না। চিকিৎসায় তোমার অনেক খরচ হচ্ছে।

স্পেশাল অফিসার

রামপ্রসাদ গান গেয়েছিলেন, মা আমায় ঘুরাবি কত, এমন চোখ-বাঁধা কলুর বলদের মত। আর আমাদের এই প্রসাদ, প্রসাদ মিত্র ডাকবাংলার হাতায় বসে মনে মনে বলছেন, কি ফ্যাসাদে ফেললে প্রভু। কারুর ওয়াইফও নই মিডওয়াইফও নই, অথচ এ কি পাপ! কুকুর ছানা কোলে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে! কুঁই কুঁই করলেই চাকরি চলে যাবে।

সময়—সন্ধ্যা। স্থান একটি জেলা শহর। শীত আসছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। বেলা একটার সময় ডাকবাংলায় একটা জিপ এসে ঢুকেছিল। জিপ থেকে নেমেছিলেন সস্ত্রীক এস ডি, ও। মেমসাহেবের কোলে ছিল এই কুকুরটি। এখন প্রসাদের কোলে।

পমেরিয়ানের বাচ্চা। মেমসাহেব মুখে ঝকঝকে দাঁতের হাসি খেলিয়ে, শরীর দুলিয়ে মন্ত্রীর হাতে কুকুর বাচ্চাটি দিতে দিতে বলেছিলেন, দিস ইজ ফর ইওর ওয়াইফ স্যার। গতবার এসে আমাকে বলেছিলেন। আই প্রমিসড হার এ বিট। আমাদের কুকুরটা তখন প্রেগনান্ট ছিল। সেন্ট পারসেন্ট পেডিগ্রিড। ঠিকমত মানুষ করতে পারলে শি উইল বি এ জয় ফর এভার।

এস. ডি. ও. ভেট দিয়ে চলে যাবার পরই মিনিস্টারের খেল শুরু হয়েছে। মিনিট পাঁচেক কুকুরটাকে ঘাঁটাঘাঁটির পরই তাঁর অরুচি ধরে গেল। (দলে অরুচি ধরার মত। তিনবার দল বদল করে, এই ক্ষেপে গদি পেয়েছেন।) কুকুরটা প্রসাদের হাতে দিয়ে

ডি. এমের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, যত্ন করবে, আদর করবে, আনন্দে রাখবে, যেই দেখবে পেট পড়ে গেছে, দুধে তুলো ভিজিয়ে চুকচুক করে খাওয়াবে। দুধ যেন বেশি ঘন না হয়, বেশি তরল না হয়। মায়ের দুধের ডাইলুসানে নিয়ে আসবে জল মিশিয়ে মিশিয়ে।

কুকুরের মায়ের দুধ কতটা ঘন, কতটা তরল প্রসাদের জানা ছিল না। ডাকবাংলার চৌকিদার, ঝাড়ুদার, খানসামা কেউ জানত না। পশুপালন বিভাগের প্রবীণ পশুচিকিৎসকও জানেন না। ডিসট্রিক্ট হেলথ্ অফিসারও এ-বিষয়ে অজ্ঞ। এত অজ্ঞতায় দেশ চলছে কি করে, কে জানে। যাই হোক প্রসাদ হাফ দুধ, হাফ জল মিশিয়ে হাসপাতাল থেকে বরিক তুলো এনে নুটি করে ভিজিয়ে দুপুরে কুকুর বাচচাটাকে নানা ভাবে চেষ্টা করেছিল দুধ খাওয়াবার। সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেঁউ কেঁউ করবে না খাবে। একটু জোর জবরদস্তি করতেই তুলোর তালটা কুকুরের গলায় চলে গেল। চোখ উলটে, দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি? প্রসাদ রেডি ছিল। কুকুরের প্রাণবায়ু বেরোলেই সেও ঝুলে পড়বে গলায় দড়ি দিয়ে। কুকুরের কান দুটো ধরে পেছনটা কোটো ঠোকার কায়দায় কার্পেটে বারকতক ঠুকতেই তুলোর ডেলা গলা ছেড়ে পেটে চলে গেল। বিপদ কাটলেও ভয় রয়ে গেল। তুলো পেটে গিয়ে হজম হবে তো? না লিভারে মেয়েদের খোঁপার জালের মত জড়িয়ে বসে থাকবে! সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সমপরিমাণ তুলো দুধে ভিজিয়ে খেয়ে বসে রইল। সেই পক্সের টিকে যে সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন তিনিও তো প্রথম নিজের ওপরেই পরীক্ষা করেছিলেন। প্রসাদ একবার ভেটিরিনারি অফিসারকেও ফোন করেছিল। সরাসরি জিগ্যেস করেনি। কায়দা করে, কুকুরে তুলো খেলে কি হয়?

ডাক্তার বলেছিলেন, জুতো খেয়ে যে জাত হজম করে, তুলো তো তাদের কাছে বেলের মোরব্বা মশাই।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধে এসেছে। মন্ত্রীমহোদয় স্নান সেরে শরীরে পাউডার ঢেলে ভস্মমাখা মহাদেবটি হয়ে ধ্যানে বসেছেন। মাথার ওপর পাঁই পাঁই পাখা ঘুরছে। শরীরের চাপে ডানলোপিলো দেবে গেছে। কোণের টেবিলে রুপোর ফোলডিং ফ্রেমে মন্ত্রীর

গুরুদেব বাঘছালে বসে আছেন। শিবনেত্র হয়ে। আর একদিকে মা মহামায়া। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ধ্যানের মাত্রাও তত বেড়ে যাচ্ছে। জন্মপত্রিকা নিয়ে জ্যোতিষীরা অঙ্ক কষে চলেছেন। হস্তরেখাবিদরা হাতের ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ফেলছেন।

মন্ত্রীর হুকুমে প্রসাদ কুকুর কোলে পাকুড় গাছের তলায় বসে আছে। কেঁউ কেঁউ শব্দে ধ্যানভঙ্গ যেন না হয়। তৃতীয় নয়নে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছেন। আর একবার গদি চাই! কত কাজ বাকি! নিজের এলাকায় জমিজমা বেড়েছে। ব্যস, আর ট্যাক্সি খাটছে। এইবার সিনেমা হল, আর একটা কোল্ড্‌স্টোর হলেই কে আর গদির পরোয়া করে! চুলোয় যাক তোদের দেশ, চুলোয় যাক রাজনীতি। চাষীর জমিতেও চাষ হবে, মন্ত্রীর জমিতেও চাষ হবে। চাষ হলেই হল! হিমঘর তো দেশের চাষ-আবাদের কল্যাণেই। অর্থনীতি বলছে ধরো, ধরে রাখো, চড়ো, আরো চড়ো, তারপর ছাড়ো। মন্ত্রী বলে কি মানুষ নন! মানুষের কাজই তো গুছনো। আখের চাষের মতই, আখেরের চাষ।

রাতে মন্ত্রী বিশেষ কিছু খেলেন না। লাঞ্চে গুরুভোজন হয়েছে। মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের স্পেশাল ডাল। সরু বাসমতী চালের দু চামচে ভাত, একটা মুরগির ঠ্যাঙ, এক চৌকো পুডিং দিয়ে রাতের আহার শেষ করে বিশাল একটি ঢেঁকুর তুললেন। পেটের মত মুখও গুরুগম্ভীর হয়ে আছে। নির্বাচন আসন্ন। জেলায় পার্টির ভেতরের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ফাটল ধরে চাকলা চাকলা। যে যেমন পারছে খাবলা খাবলা টাকা মেরে সরে পড়েছ। কোঁদল শুরু হয়ে গেছে। কোঁদল থেকে কোদাল। কোদালেই কবর তৈরি হয়। দাঁতে কাঠি খুঁচতে খুঁচতে ডাকবাংলোর বারান্দায় পায়চারি করেছেন আর সুর করে বারে বারে একটি নামই উচ্চারণ করছেন, বসন্ত, বসন্ত। অসুখ বসন্ত নয়, মানুষ বসন্ত। রাজনীতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। হজমী-পায়চারি চালাতে চালাতে প্রশ্ন করলেন খাওয়া হয়েছে?

প্রসাদ বললে, এইবার বসব স্যার।

মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমায় নয়, তোমায় নয়, কুকুরের খাওয়া হয়েছে?

হয়েছে স্যার।

সারাদিন ক' লিটার দুধ খেয়েছে ?

প্রসাদ বিপদে পড়ে গেল। ক' ফোঁটায় লিটার হয় জানা নেই। কেউ যদি প্রশ্ন করেন ক' লিটার কেঁদেছে, কোন উত্তর হয় কি? প্রসাদ বললে, প্রায় এক বাটি।

ইডিয়েট। তোমার মাপজোকের কোনও ফ্যাকালটি নেই। চেষ্টাও কর না। সেদিন ডিসট্রিক্ট কনফারেন্সে জিগ্যেস করলুম, জেলায় কত ধান হয়? বলতেই পারলে না। ইন এফিসিয়েন্ট। মন্ত্রীর সঙ্গে ঘুরছো, স্ট্যাটিসটিকস তোমার মুখে মুখে থাকা উচিত। যখন যা চাইব, চটপট বলে দেবে। তা না, হাঁ করে নিরেট নীরেনের মত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। দেশের বারোটা তোমরাই বাজাবে। যেমন অ্যাডমিনস্ট্রেসানের অবস্থা, তেমনি পলিটিক্সের অবস্থা। আমার কি, তোমরাই বুঝবে ঠ্যালা।

মন্ত্রী হাই তুললেন। ঘুম আসছে। জড়ানো গলায় বললেন, আমি শুয়ে পড়ছি। কাল ভোরেই বেরতে হবে। তুমি কুকুরটাকে কাছে নিয়ে শোবে। মাতৃস্নেহে সারারাত রাখবে। একটা মা বের করার চেষ্টা কর প্রসাদ। পৃথিবীতে মায়ের বড়ো অভাব। খরা চলেছে। স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, থাকার মধ্যে ছত্রিশটা দল। ভোট ভাগাভাগি। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

চৌকিদার প্রসাদকে বললে, বাবু ওটাকে হিসি করিয়ে নিয়ে শুতে যান। তা না হলে বিছানা ভেজাবে। সব সময়েই তো কেঁউ কেঁউ করছে। বুঝবেন কি করে, কোন কেঁউটা হিসির। প্রসাদ গাছতলায় কুকুরটাকে রেখে হিস্ হিস্ হিস্ হিস্ করতে লাগলো। চারপাশে গাছ, মাথার উপর তারাভরা আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কুকুরটা পায়ের কাছে গোল হয়ে ঘুরছে আর কেঁউ কেঁউ করছে। মানুষের বাচ্চা হিস্ বোঝে। কুকুরের ভাষাটা কি? প্রসাদ বিরক্ত হয়ে বারকতক ঘেউ ঘেউ শব্দ করে কুকুরের ভাষা নকল করার চেষ্টা করল। লাভ হল না। শেষে ধৈর্য হারিয়ে বিছানায় চলে এল। সাধে বলে, মা হওয়া কি মুখের কথা!

অনেক রাতে প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল। পেটের কাছটা ভিজে ভিজে লাগছে। পাজামার দড়িটাকে মাতৃস্তন ভেবে মুখে পুরে

মন্ত্রীর কুকুর সারারাত চুকুর-চুকুর চুষে ভিজিয়ে দিয়েছে। কেমন গুটিসুটি মেরে কোলের কাছে শুয়ে আছে। প্রসাদ বড়ো সন্তুষ্ট হল, যাক এতক্ষণে কুকুরে কুকুর চিনেছে!

হাইওয়ে দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি ছুটছে। সবুজ রঙের ঝকঝকে অ্যামবাসাডার। অন্যান্য বার প্রসাদ সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে, এবারে কুকুরের ইঞ্জিনের গরমে কষ্ট হবে বলে মন্ত্রী নিজেই সামনে বসেছে। প্রসাদ পেছনের আসনে। কোলের ওপর তোয়ালে তার ওপর কুকুর। পাশে প্লাস্টিকের ঝুড়িতে দুটো ফিডিং বোতল। একটায় দুধ আর একটায় জল। প্রসাদের নিজের চান আর ব্রেকফাস্ট না হলেও কুকুরের প্রসাধন হয়েছে। পাউডার পড়েছে গায়ে, লোমে বুরুশ পড়েছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাঝে মধ্যে প্রসাদের কোল ছেড়ে খচরমচর করে পালাবার চেষ্টা করলেও সুবিধে করতে পারছে না। একদিনেই প্রসাদ বাচ্চা সামলাবার কায়দাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। মন্ত্রীকে সামলাতে পারে না ঠিকই। মন্ত্রীও কি পারেন ভোটার সামলাতে, দপ্তর সামলাতে, দল সামলাতে। প্রসাদ ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কুকুরকে চুষতে দিয়েছে, তাইতেই জীবটি বোকা বনে প্রসাদের কোলে পড়ে আছে। সেই একই টেকনিক। দেশের মানুষও তো ওই একই ভাবে পড়ে আছে, রাজনীতির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষে। ওরাও জীব এরাও জীব। ওরা পাঁচ বছর পারে আর এ ব্যাটা ঘণ্টা ছয়েক পারে না? বোকা বানানো কি এতই শক্ত!

মাইল চারেক আসার পর মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ একবার করিয়ে নাও। প্রসাদ রাস্তার পাশে নেমে কুকুরকে হিস্ হিস্ করতে করতে নিজেরই পেয়ে গেল। করার উপায় নেই। গাড়িতে ফিরে এল। মন্ত্রী বললেন, ড্রাই হয়ে গেছে সিসটেম, একটু জলের বোতলটা ধর।

আবার মাইল চারেক গিয়ে মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ ট্রাই কর। প্রতি চার মাইল অন্তর প্রসাদ নামে আর ওঠে। এদিকে নিজের পেট ফেটে যাবার অবস্থা। কুকুরের বদলে তাকে করতে বললে ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি করে দিতে পারে। শেষে শান্তিপুরের কাছে একটা জংলা জায়গায় প্রসাদ কুকুর নিয়ে নেমে আর সামলাতে

পারল না। নিজেও বসে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বোধ হয়। পেছন ফিরেই চক্ষু চড়কগাছ। কুকুর নেই! কিছু দূরে হাইওয়ের ওপর মন্ত্রীর সবুজ গাড়ি। প্রসাদ চাপা গলায় ডাকল, আয় আয় তু তু। ডাক শুনে নিচের ঢালু জমি থেকে একটা ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুকুর উঠে এসে ন্যাজ নাড়তে লাগল। শ্যার ব্যাটা, তোকে কে ডেকেছে! প্রসাদের মনে হল, সে যে ডাকে ডেকেছে তাতে নেড়িই সাড়া দেবে। বিলিতির ডাক আলাদা। জোরে ডাকতে পারছে না, মন্ত্রী শুনতে পেয়ে যাবেন। হঠাৎ নেড়িটা ঢাল বেঁকে একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে গরর গরর শব্দ করতে লাগল। মরেছে। মন্ত্রীর কুকুর বোধ হয় ঝোপে গিয়ে ঢুকেছে। কামড়ে ছেড়ে দিলে রক্ষে নেই। পড়ি কি মরি করে প্রসাদ ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে পা হড়কে সড়াত করে ফুট ছয়েক ছেঁচড়ে নেমে গেল। প্রসাদের পতন দেখে নেড়িটা ভয়ে সরে গেছে। প্রসাদ ঝোপঝাড় থেকে বাচ্চাটাকে বগলদাবা করে কামড়ের হাত থেকে বাঁচালেও নিজে আর ওপরে উঠে আসতে পারছে না। পতন যত সহজে হয় আরোহণ তত সহজে হয় না। দুটো হাত কাজে লাগাতে পারলে হয়ত হত। এক হাতে কুকুর। ছফুট ওপরে আকাশের পটে মন্ত্রী মহাশয়ের মুখ দেখা গেল। তিনি কিছু বলার আগেই প্রসাদ নিচে থেকে বললে, পড়ে গেছি স্যার।

মন্ত্রীর মুখটি প্রসাদের চোখে কালো আর বীভৎস দেখাচ্ছে। পেছনে উজ্জ্বল আকাশের জন্যেই বোধ হয় ওই রকম মনে হচ্ছে। সাদা দাঁত ফাঁক হয়ে লাভাস্রোতের মত মন্ত্রীবাক্য নিঃসৃত হল।

পড়লে কি করে?

প্রসাদ কুকুরটাকে দেখিয়ে বললে, আজ্ঞে এ বড়-বাইরে করতে নেমেছিল।

ড্রাইভারের সাহায্যে প্রসাদ ওপরে উঠে এল। কেটেকুটে গেছে। হাতে বাবলা কাঁটা ফুটে গেছে। চেহারা দেখে মন্ত্রী বললেন, অপদার্থ! গুড ফর নাথিং।

এক মাসের মধ্যে প্রসাদের প্রোমোশান হয়ে গেল। যে ফাইল কিছুতেই নড়ছিল না কখনও ডিপার্টমেন্টে আটকায়, কখনও ফাইনান্স থেকে অবজেকসান নিয়ে ফিরে আসে, সেই ফাইল হঠাৎ

সচল হয়ে প্রসাদকে ভাঙা চেয়ার থেকে চেম্বারে তুলে দিলে। মন্ত্রীর কুকুরের বয়েস বেড়েছে, প্রসাদের পদমর্যাদাও বেড়েছে। চেম্বার ছোট হলেও চেম্বার। টেবিলে কাঁচ। চেয়ারের পেছনে ভাঁজ করা তোয়ালে। প্রসাদের কতদিনের আশা। চেম্বারের বাইরে নেমপ্লেট। কাঠের টুকরোর ওপর সাদা হরফে লেখা— স্পেশাল অফিসার। কিসের স্পেশাল অফিসার তা ঠিক না হলেও স্পেশাল অফিসার। টেবিলে আবার ঘন্টা পেয়েছে। টিপলেই কোঁ কোঁ করে বেজে ওঠে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল চকখড়ি দিয়ে স্পেশাল অফিসারের পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে কে বা কারা লিখে গেছে, ডগ। প্রসাদ মিত্র। স্পেশাল অফিসার (ডগ)। তা লিখুক। প্রসাদ এখন মিত্তির সাহেব। অধস্তনেরা স্যার সম্বোধন করে।

বিলিতি বাঁশ

হাজার পাঁচেক টাকায় আমি একটা বাঁশ কিনেছি।

সে কি মশাই, একটা বাঁশের দাম পাঁচ হাজার টাকা! কী বাঁশ!

বিলিতি বাঁশ। বাঁশের নাম রেফ্রিজারেটার। বাঁশ ভেবে কিনিনি। কিন্তু এখন বাঁশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে জানত আমি খাল কেটে কুমির এনেছি! তিন দিনের বাজার একদিনে ঘাড়ে করে এনে ঢুকিয়ে দেব। সকালের খাবার রাতে ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে আসবে। আগুনে একটু নেড়েচেড়ে পাতে ফেল। ওদিকে টিভি চলছে। এদিকে চশমা চোখে গৃহিণী ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে ম্যাগাজিন পড়ছেন। পাপোশে সাদা মত গোল বেড়াল। পাঁচ হাজার টাকায় তুমি সন্ধ্যায় অফুরন্ত অবসর কিনে এনেছ। তুমি তো মার্টিন লুথার কিং হে। তিনি আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্যে জীবন দান করেছিলেন, তুমি তোমার হার্ড-আর্মড পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে সংসারের এতকালের ক্রীতদাসত্বের অন্তত একবেলার জন্যে হাতা খুন্তি-বেড়ির হাত থেকে মুক্ত করেছ। সকালে রাঁধ, বিকেলে খাও। এবং কত কি খাও। বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গালগলা ফুলিয়ে আট রকম সুরে স্টিরিও গলায় কথা বল। ফাটা গলা কত বড় স্ট্যাটাস সিম্বল। কথায় কথায় কেমন বলা যায় —আর বল কেন ভাই, ঠাণ্ডা জল, না খেয়েও পারি না, খেলেও

গলা নেয় না। হে হে মডার্ন ভাইস। তারপর ওই আইসক্রিম আর পুডিং! খেতে ভাল; কিন্তু পেট গরম হয়। ফ্রিজের ভাই ওই একটাই সুবিধে, রোজ সকালে ইডিয়েটের মত বাজারে ছুটতে হয় না। অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় বেশ ওলট পালট খাওয়া যায় শুশুকের মত। মাখন! নো মাখন প্রবলেম। ফ্রিজে ব্যাটা মহাজব্দ। গলে ঘি হবার উপায় নেই। সদাসর্বদাই টাইট যৌবন। সকালে ছুরি দিয়ে সেই হালকা হলুদ স্নেহ রুটির ওপর পুরু করে প্রলেপ দিয়ে, জ্যামের অঙ্গরাগে আরও মধুর করে মুখে ভরে ফেল। ভুঁড়ি! নেভার মাইণ্ড। বেল্ট আছে। হার্ট! ও তো এমনিও যাবে অমনিও যাবে। ফ্রিজে তিনদিন চমচম ফেলে রেখে ফোর্থডেতে বের করে খেয়ে দেখেছ! উঃ সে এক এক্সপিরিয়েন্স মাইরি! কোথায় লাগে লাগে সুন্দরী রমণীর মুখ চুম্বন। এক এক টুকরো কেটে কেটে মুখে পুরবে মনে হবে কে যেন পটাপট তোমার মুখে কাথবার্টসন হার্পারের জুতো মারছে। ক্ষীরমোহন রাখতে পার। রাখতে পার বেশ বড় সাইজের রসগোল্লা। খেতে খেতে মনে হবে তুমি প্যারাডাইসে উর্বশীর কোলে বসে নরম উল দিয়ে সোয়েটার বুনছ!

যাঁদের ফ্রিজ নেই তাঁদের কাছে এই সব কথা বললে মনটা বেশ হালকা হয় ঠিকই। পাঁচ হাজার উসুল হয় তিলে তিলে। তবে কে জানত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের মত ফ্রিজেরও, একটা লোয়েস্ট ব্যালেন্স আছে। ফ্রিজকেও সাজিয়ে রাখতে হয়। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে সেই কড়ি, একটা আয়না, লালচেলি, একটু সোনা রুপোর টুকরো রাখার মত। বোতল বোতল জল। তেমন খরচ নেই। যে লোকটি রোজ সকালে কাঁধে একটা বস্তা ফেলে শিশি আছে, বোতল আছে হেঁকে যায় তাকে ডেকে এক ডজন সমান মাপের বোতল কিনে একটু স্টেরিলাইজ করে জল ভর আর রাখ। খাও আর ভর। ভর আর খাও। সামান্য কায়িক পরিশ্রমেই কার্যোদ্ধার। কিন্তু তারপর আর যা যা রাখতে হবে, যেন মেয়ের বাড়িতে জামাইষষ্ঠির তত্ত্ব। আহা, ফ্রিজের লোয়েস্ট ব্যালেন্স ঠিক রাখতে গিয়ে ব্যাঙ্কের লোয়েস্ট ব্যালেন্স ধরে টানাটানি।

এক ডজন ডিম ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখতে

হবে। ফ্রিজের ডিম। হাত দেওয়া চলবে না। দু বোতল স্কোয়াশ। ফ্রিজের স্কোয়াশ। খাওয়া চলবে না। আপেলের সময় আপেল, কমলালেবুর সময় কমলালেবু, সারি সারি সাজিয়ে রাখতে হবে। কনডেনসড মিল্ক, মাখন চিজ। দুটো মুরগির ঠ্যাঙ। এক চাকা মাটন। একটু মাছের টুকরো। প্রথামত ফ্রিজে, ফ্রিজের দাবি অনুযায়ী যা যা রাখার রাখতেই হবে। যখন দরজাটি খুলবে টুক করে আলো জ্বলে উঠবে। সেই আলোতে ফ্রিজের জগৎ যেন পরিপূর্ণ দেখায়। ঠাণ্ডা হিমেল ধোঁয়া। সাদা বোতল, রঙিন বোতল, গোল গোল ডিমের শুভ্রতা। নিহত মুরগীর জমাট ঠ্যাঙ। কাশ্মিরী রমণীর গালের রঙ চুরি করা হিমসিক্ত আপেল। পয়সা নেই বললে চলবে না। ধার করে মেয়ের বিয়ে দেবার মত ফ্রিজও সাজাতে হবে। ওসব চালাকি চলবে না। অনেকে বাড়ি তৈরির পর কৌপিন পরে ঘুরে বেড়ান; রাতে জল-পথ্যের ব্যবস্থা। কি করব ভাই বাড়ি করে পেনিলেস। সে পেনি আর ফিরে আসেও না। ওই ভাবেই ইন-কমপ্লিট বাড়ি থেকে সোজা চিতায়। সে তবু ক্ষমা করা যায়। তা বলে গড়ের মাঠ ফ্রিজ ঘরের কোণে শুভ্র মাহাত্ম্যে গড়ড় গড়ড় শব্দ করবে আর নির্ভেজাল জল পরিবেশন করবে তা তো হতে পারে না। খুললেই নানারকম মাল বেরোন উচিত এবং একটু বিলিতি বিলিতি হওয়া চাই। পান্তা ভাত বেরোলে চলবে না। তবে ওই মালেরই বিলিতি সংস্করণ হুইস্কি বেরোলে, হ্যাঁ তুমি রিয়েলি ফ্রিজেল মানুষ।

যাক যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বিয়ে করে বউকে যেমন ফেলা যায় না তেমনি পয়সা খরচ করে কেনা এই বিলিতি বাঁশকে তো আর ফেলা যাবে না। তিনি এখন গর্ভে নানারকম জিনিস ধারণ করে বসে আছেন। হলুদবাটা, সরষেবাটা, পাকা পটল, ঢ্যাঁড়শ। ন্যাবালাগা পাকা পেঁপে। উদ্বৃত্ত সেদ্ধ ডাল। আছে থাক। তবে একটা সমীক্ষা করে ফ্রিজ কেনা উচিত ছিল। যে পাড়ায় বাস সে পাড়ায় আর মাত্র দুটি বাড়িতে এই যন্ত্র আছে। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ একটু উগ্র মেজাজের। মাঝে মধ্যে ছুরি ছোরা চালিয়ে অন্যরকম একটু ভাবমূর্তি তৈরি করে রেখেছেন। দ্বিতীয়টি আছে জনৈকা এয়ার হোস্টেসের ঘরে।

ফলে মরেছি আমি। এর তার কাছে ফ্রিজের গর্ব ফলাতে গিয়ে স্বখাত সলিলে হাবুডুবু খাচ্ছি।

একদিন সকালে নিত্যানন্দ চার বোতল জল এনে হাজির।

কি খবর নিতু, সাত সকালেই জলের বোতলে বগলে। সাপখোপ বেরোল বুঝি?

আজ্ঞে না কাকাবাবু। বাবার হার্টের অসুখ তো!

ও সেই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ মিশিয়ে দিতে হবে? বেলিসপেরিস!

আজ্ঞে না। এই চারটে বোতল আপনার ফ্রিজে রেখে যাব। একটু ঠাণ্ডা জল খেলে শরীর শীতল হবে। হার্টের ঝটরপটর ভাবটা ডাক্তার বলেছেন কমতে পারে। দুপুরে দু বোতল নিয়ে যাব, সন্ধ্যেবেলা এক বোতল আর রাতে এক বোতল। আবার সকালে চারটে বোতল রেখে যাব। সামান্য ব্যাপার কাকাবাবু! অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না তো! অসন্তুষ্ট হবার কি আছে বলুন? একজন হার্টের রুগী, একটু যদি ভাল থাকেন, কি বলেন? আচ্ছা আসি। বোতল চারটে রইল, কেমন! ঠিক করে রাখবেন, যেন বেশ ঠাণ্ডা হয়!

হরিদা এলেন। হাতে একটা মাখনের থান ইট।

বিমান ভায়া!

বলুন দাদা।

এটিকে যে তোমার ঠাণ্ডা মেশিনে আশ্রয় দিতে হবে। তোমার কৃপায় এইবার আমার ব্রেকফাস্ট প্রবলেমটা মিটল। ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার, এর চেয়ে ভাল খাবার এই বাজারে আর কি আছে বল। সেই শীতকাল ছাড়া মাখন খাবার উপায় ছিল না। তুমি যে দেশের দশের কি উপকারই করলে ভাই। তোমার কাছে কোথায় লাগে সেই আহম্মক পলিটিস্যানরা। আসতে আসতেই একটু নরম হয়ে এসেছে কি পোড়া দেশে আমরা বাস করি দেখেছ! সাতটা মাসই গরম। হোয়্যার ইজ ইউরোপ! ভাবতে পার সাইবেরিয়া এখন সাতফুট বরফের তলায়। যাদের ভাল হয় তাদের সবই ভাল। ফুড, ওয়েদার, লিভিং। নাও এটাকে একটা ভাল জায়গায় রাখ। এ বাজারে কটা লোক মাখন খেতে পারে। নেহাত তোমার পিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহের আশীর্বাদে চাকরিটা ভাল করি তাছাড়া তেমন

অসংযমী নই। প্ল্যানড ফ্যামিলি। হ্যাঁ শোন, পাছে তোমার মাখনের সঙ্গে আমারটা গুলিয়ে ফেলতে পার ভেবে আমি এই র‍্যাপারের ওপর স্কেল ফেলে ফেল্ট পেন দিয়ে এক ইঞ্চি অন্তর লাইন টেনে রেখেছি। রোজ এক ইঞ্চি করে কেটে নিয়ে যাব। ছ'দিন চলবে। হিসেবের কড়ি বাঘে খাবার উপায় নেই। হেঃ হেঃ বাবা।

কাকিমা!

কে রে!

আমি অর্চনা!

তোমার হাতে ওটা কিসের হাঁড়ি।

রসগোল্লা।

কি হবে? তোমার জন্মদিন। ও না, সে পরীক্ষা পাশের আনন্দ। বাবা কতদিন পরে! ঠিক মনে আছে। না খাইয়ে ছাড়বে না। গণ্ডারের গোঁ।

না কাকাবাবু। বাবা পাঠালেন ফ্রিজে রাখতে। কাল গোবরডাঙায় গিয়েছিলেন। মিষ্টি দেখলে তো আর জ্ঞান থাকে না, তার ওপর সস্তা দেখছেন। চল্লিশটা আছে। রোজ দশটা করে বের করে নিয়ে যাব।

সেই রসগোল্লা। তৃতীয় দিন সকালে অর্চনার মা এলেন। দশটা বের করার পর গম্ভীর মুখে বললেন, কেমন হল?

আমার স্ত্রী বললেন, কি আবার হল?

আরও দশটা থাকার কথা, ছটা রয়েছে কেন? এই তো আমার হাতে দশ হাঁড়িতে ছয়। ষোল কেন হবে, হবে তো কুড়ি। চারটে শর্ট।

তোমার হিসেবে ভুল হচ্ছে হয়ত।

না, আমার হিসেব ঠিক আছে। হিসেবের কড়ি, বাঘে খেলেও বুঝতে পারব।

তার মানে তুমি বলছ আমরা খেয়েছি।

কিছু বলতে চাই না, তবে চারটে কম। এ বাজারে কাউকে বিশ্বাস নেই। সবকটাই নিয়ে যাই বাবা।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, তুমি খেয়েছ?

আমি? আমার না হাই সুগার। গোবরডাঙার ওই মাল খেয়ে মরব নাকি। স্ত্রীর জেরা চলল। ছেলে খায়নি মেয়ে খায়নি, যে কাজ করে শঙ্করী, সে খায়নি। অর্চনার মা যেতে যেতে বললে, তাহলে পিঁপড়ে খেয়েছে!

স্ত্রী আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, এ তোমারই কাজ। মিষ্টি খাওয়া বন্ধ। সারাদিন ছোঁক ছোঁক কর। মাঝরাতে উঠে মেরে দিয়েছ। ছি ছি লজ্জা করে না!

একেই বলে সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর।

টেলিফোন

নিজেই নিজেকে বাঁশ দিয়ে বসে আছি। বাঁশ যে কত রকমের হতে পারে ধারণা ছিল না। কেতাবে পড়েছিলাম, মুগুলি, তলতা আর গেঁটে। সে সব হল কাজের বাঁশ। উপকারী বাঁশ। যে বাঁশ আমরা পরস্পর পরস্পরকে দিয়ে থাকি সে বাঁশ অদৃশ্য এবং তার ধরন বহু। সংস্পর্শে না এলে জাত বোঝা যায় না। যেমন আমি এখন চারটে বাঁশের পাল্লায় পড়েছি। চারটেই আছোলা এবং নগদ মূল্যে কেনা। বন্ধু ভেবেই কেনা। এখন তারা মহাশত্রুর চেহারায় গলা দিয়ে গান বের করে ছেড়েছে, গেছে সুখ গেছে শান্তি।

বাম্বু নাম্বার ওয়ান, টেলিফোন। একটা টেলিফোন নাও হে। কত বড় স্ট্যাটাস সিম্বল। ইয়া মোটা একটা বইতে তোমার নাম থাকবে। কত জ্ঞানী, গুণী, সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একাসনে। অজ্ঞাতকুলশীল নও। ডাইরেক্টরিতে নাম। নামের পাশে নম্বর। এই শহরের নম্বরী কয়েদী। লোককে কেমন বড় গলায় বলতে পারবে, কাল তাহলে সকালে ফোন করো। তিনি তখন মুখটা করুণ করে বলবেন, আমার যে ফোন নেই। সঙ্গে সঙ্গে তুমি কত উঁচুতে উঠে যাবে। টেলিফোনের হাতে লাটাই, স্ট্যাটাসের আকাশে তুমি একটি ঘুড়ি। এক টানে চড় চড় করে তুমি সুনীল আকাশে নারকেল গাছের মাথার ওপর উঠে লাট খেতে থাকবে। এক কথায় ফ্রম ছাতুবাবু টু লাটুবাবু। মানুষের বর্তমান জাতিভেদ তো এইভাবে—

আমার ফোন আছে, তোমার নেই। আমার ফ্রীজ আছে, তোমার ফ্রীজ নেই। আমার গাড়ি আছে, তোমার গাড়ি নেই। কিংবা আমার স্কুটার আছে, তোমার সাইকেল। আমার মোটর সাইকেল, তোমার মোপেড! আবার এইভাবেও হতে পারে—তুমি দোতলার ফ্ল্যাটে থাক, আমি থাকি আটতলায়, ছ'তলায়। অবশ্য দোতলা এই-ভাবে ছ'তলার জাতে উঠতে পারেন, আমার যে হার্ট ভাই। তার মানে দোতলা উইথ হার্ট ইজ ইকোয়াল টু ছ'তলা উইদাউট হার্ট।

মানুষের জাতিভেদ আবার এভাবেও হতে পারে—আমার বউ সুন্দরী, তোমার বউ মাটো সুন্দরী। আমার বউয়ের গায়ের রং দুধে-আলতায়, তোমার বউ কেলে-ক্যাকটাস। অবশ্য এইভাবে কাটান দেওয়া যেতে পারে, কালো হলে হবে কি ভাই, শ্বশুর বিশাল বিশাল, বিশাল বড়লোক। তার মানে দুধে-আলতার হাজব্যাণ্ড ইজ ইকোয়াল টু রিচ বাপের কালো মেয়ের হাজব্যাণ্ড।

জাতিভেদ আবার এইভাবেও হতে পারে, আমার বাড়ির দক্ষিণ খোলা, তোমার বাড়ির দক্ষিণ চাপা। আমার সাউথে বাড়ি তোমার ন্যাস্টি নর্থে। আমার ছেলে শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ার, তোমার ছেলে যাদবপুরের। এই যখন জগত তখন তোমার উপায় থাকতে একটা ফোন নেবে না কেন? তাছাড়া টেলিফোন এমারজেন্সির সময় কত কাজে লাগে জানো? ধর তোমার হঠাৎ থ্রম্বোসিস হল, অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে। জাস্ট ডায়াল। কত যেন নম্বর? অ্যাম্বুলেন্স তেড়ে এলো, মাথার ওপর নীল আলো ঘোরাতে ঘোরাতে। কি অলক্ষুণে কথা! কেন? থ্রম্বোসিস হবেই। আজ হোক, কাল হোক, হবেই হবে। হয় করোনারি, না হয় সেরিব্রাল। শোননি জন্মিলে মরিতে হবে। তারপর ধর তোমার বউ বাথরুমে ঢুকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি জেবলে দিল। সে আবার কি? একটা সম্ভাবনা। হতেই পারে। এ যুগ হল সেলফ ইমমলেশানের যুগ। সকলেরই আত্মঘাতী হবার প্রবল ইচ্ছা হিক্কার মত গলার কাছে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। একটু উসকে দিলেই হল। ফোন থাকলে কত সুবিধে। ঝট করে ডাক্তার ডাকতে পারবে। পুলিশে খবর দিতে পারবে। বাড়িতে মাঝরাতে ডাকাত পড়তে পারে। তখন তোমার ফোন কত হেল্পফুল হবে জানো। অফিস থেকে মাইনে

নিয়ে ফেরার পথে তুমি ছুরিকাহত হতে পারো। তখন তুমি হাস-পাতালে গিয়ে খাবি খাবে। সেই সময়ে তোমার বাড়িতে ফোনে খবর দেওয়া সহজ হবে।

ভাল দিকও আছে। ফোন হলে ক্রশ কানেকসানে প্রেমালাপ শুনবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঝগড়াও শুনতে পাবে। টেলিফোনে স্ত্রী ঝাড়ছে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীকে। স্বামী ঝাড়ছে শ্বশুর-বাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা উড়ু উড়ু মেজাজের বউকে। শুনতে পাবে সিনিয়ার শাসাচ্ছে জুনিয়ারকে। শুনতে পাবে ঘুষের কথা, শেয়ার মার্কেটের কথা। টেলিফোনে এক ব্যবসাদার এক ব্যবসাদারকে ভাও বলছে। কত সব গোপন কথা রিসিভার তুললেই শুনতে পাবে। কত পাগল আছে জানতে পারবে। কুকুর পাগল, ফুল পাগল, পাখি পাগল, বউ পাগল, খেলা পাগল, ঘোড়া পাগল।

তা ছাড়া ফ্রী মেলে তুমি মাঝে মাঝে নানা রকম চিঠি চাপাটি পাবে। নতুন ম্যাগাজিন বেরিয়েছে। স্টেনলেস স্টিলের বাসন পাওয়া যাবে পোস্টে। বশীকরণের মাদুলি দিচ্ছেন বিলেত ফেরত তান্ত্রিক। ভাগ্য বলে দিচ্ছেন মিডল ইস্টের পামিস্ট। দুর্বলতা কাটাবার ট্যাবলেট বেরিয়েছে রুপোলি মোড়কে মোড়া। হাঁপানির দাওয়াই বেরিয়েছে। পনেরো দিনে সারাবার গ্যারাণ্টি। ফুসফুস ক্লিয়ার। বাঁশি বাজানো যাবে ইচ্ছে করলে। ভুঁড়ি আর মেদ কমাবার গেজেট। পাকা চুল এক রাতে কাঁচা করে দেবার আয়ু-র্বেদিক লোশান। যৌবন ফিরিয়ে আনার স্বপ্নদত্ত কবচ। কত কি যে তুমি পেতে থাকবে ধারণা নেই। পৃথিবী যে কত মধুময় জানতে পারবে।

একেই বলে গ্যাস খাওয়া। সেই ফোন এসে বসল দু' দেও-য়ালের কোণে চকচকে টেবিলে। আহা! কি শোভা। দ্বিতীয় তাকে রেক্সিন মলাটে ডাইরেক্টরী। যার কোন এক পাতায় পিঁপড়ের মত খুদিখুদি অক্ষরে আমার নাম ছাপা। শ' পাঁচেক ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে ফেলেছি। নামের তলায় ফোন নং। লেটারহেড এসে গেছে। কত বড় একটা ব্যাপার। জটাধারীর মত ফোনধারী। ইউরোপ, আমেরিকা হলে কিছুই নয়। ভারতবর্ষে দিস ইজ

সামথিং। পাঁচজনকে বলা চলবে। আমার কোন প্রবলেম নেই, যেই গ্যাস ফুরোল সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটারকে ফোনে বলে দিলুম। ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়েছে, জাস্ট এ ফোন। ডাক্তার। জাস্ট এ কল। হ্যাঁ ভালই আছি। রিপিট প্রেশক্রিপশান। তিন নম্বর ওষুধটা বাদ। থ্যাঙ্ক ইউ। পোলাও খেয়ে পেট ছেড়েছে? অফিসে ফোনে জানিয়ে দাও, আজ আর আমি যাব না। বিকেলে তেড়ে বৃষ্টি এসেছে? অফিস থেকেই বাড়িতে ফোন, হ্যালো, হ্যাঁ শোন, খিচুড়ি লাগাও উইথ গরম গরম বেগুনি অ্যান্ড পাঁপড় ভাজা।

কিন্তু এমন সম্ভাবনার কথা আমাকে আগে কেউ বলেনি তো? এই ভাদ্রমাসের ঠিকুর রোদে ছাতা মাথায় আমি চলেছি। কোথায় চলেছি! ডাক্তার ডাকতে? পোস্ট অফিসে চিঠি রেজিস্ট্রি করতে? না আমার বাড়ি থেকে বত্রিশটা বাড়ি উত্তরে সোমাদির বাড়ি। আমার দিদি নয়। নারকেলডাঙা থেকে যে যুবকটি ফোন করছে তার দিদি। যুবকটি আমাকে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করেছে। তার মানে সোমা নামক মহিলাটি সম্পর্কে আমার কে হলেন? জানার দরকার নেই। ছেলেটির গলায় প্রচণ্ড উদ্বেগ। কি জানি কোন বিপদ আপদ কিনা! তার সোমাদিকে ডেকে দিতেই হবে। মানবিক কর্তব্য। সোমাদি বাথরুমে। সেইখান থেকেই খুশির গলায় বলে উঠলেন, ও বুঝেছি। নাড়ু ফোন করেছে। আমার তো বাথরুম থেকে বেরোতে একটু দেরি হবে কাকাবাবু। আমি কাকাবাবু! আমি তাহলে দুজনেরই কাকাবাবু! ভাল। কি করব তাহলে? আপনি শুধু জিজ্ঞেস করবেন, টিকিট পেয়েছে কি না। যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে বলবেন, আমি মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। আসতে যেন দেরি না করে। বলবেন একা একা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে। তোড়ে জল পড়ার শব্দের সঙ্গে বাথরুম থেকে গান ভেসে এলো—আমি বনফুল গো-ও।

হ্যালো। ভাইপো, আমার ভাইঝি, তোমার দিদি এমন স্নান-ঘরে বনফুল। তুমি কি টিকিট পেয়েছ বাবা? হ্যাঁ পেয়েছি কাকাবাবু। তবে দুপুরের নয় বিকেলের। ওর সঙ্গে কথা ছিল

দ্পুরের। আপনি কাইণ্ডলি সময় পরিবর্তনটা একটু বলে আসুন।

ফোন শেষ হলেও চান শেষ হয়নি। মেয়েদের স্নান হল জল-হস্তীর স্নান। চলছে চলবে! হ্যাঁ, টিকিট পেয়েছে। তবে ম্যাটিনির নয়, ইভনিং শোর। ও হাউ সুইট! ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে! কে সুইট, কাকাবাবু না সেই অদৃশ্য অজানা নারিকেল ভাইপো!

সামনের বাড়ির শিখার বাবা সেদিন খুব ঝাড় দিলেন। আপনি মশায় মিটমিটে শয়তান। ভদ্রলোক উত্তেজিত হলে খুব মশয় মশয় করেন। মুদ্রা দোষ। আমার অপরাধ? ইউ আর এ ক্রিমিন্যাল। ছুপা রুস্তম। সে আবার কি? হিন্দি সিনেমা নাকি? আপনি একটা ভিলেইন। ভিলেনির কি দেখলেন? আমার মেয়ে শিখা আপনার বাড়ি থেকে ফোন করে? হ্যাঁ মাঝে মাঝে করে, রোজই করে। কেন করতে দেন? সে কি! একবার রাত নটার সময় আপনার এক বন্ধু মাছ ধরার চারের ফর্মুলা জানবার জন্যে ফোন করেছিলেন। সেদিন আমার জ্বর। মাথার যন্ত্রনায় ছটফট করছি। বাইরে বৃষ্টি। আপনার মেছো ফ্রেণ্ডকে বলেছিলাম, ভাই কাল সকালে ফোন করুন। সেই বন্ধু পরে আপনাকে বলেছিলেন, সামনের বাড়ির লোকটা ছোটলোক। অসামাজিক। পাড়া থেকে দূর করে দেওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমাকে তেড়ে এলেন। আপনার ছেলে রাস্তায় দেখা হলেই বলতে শুরু করল, টেকো চলেছে, টেকো। শালার পয়সা হয়েছে। একদিন বসার ঘরে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেল। দুর্গাপুজোয় গলায় গামছা দিয়ে একশো টাকা চাঁদা নিয়ে গেল। অসামাজিক নির্যাতনে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আপনার মত আদর্শ সামাজিক মানুষের মেয়েকে টেলি-ফোনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে একঘরে হতে চাই না।

নোওও! ভদ্রলোক সকালের সাইরেনের মত চিৎকার করে উঠলেন। বাই অ্যালাউয়িং শিখা টু ইউজ ইওর ফোন ইও আর এইডিং অ্যাণ্ড অ্যাবেটিং এ ক্রাইম। আপনার জানা উচিত এ বাজারে একটা আইবুড়ো মেয়ে যখন ফোন করে তখন কাকে করে? বয় ফ্রেণ্ডকে। বয় ফ্রেণ্ড মানে কি? লুটেরা। ভোমরা। ফুলে ফুলে মধু খাব কিন্তু পিঁড়েতে কভি নেহি বৈঠেগা। চোখের

সামনে দেখছেন একটা মেয়ে চিটেড হচ্ছে, প্রেমের উপন্যাস আর হিন্দি ছবি দেখে ইশক্ ইশক্ বলে বলে লাফাচ্ছে, কোথাকার কে এক ডাঁসা ছেলেকে আপনারই টেলিফোনে ইনটিমেট হবার সুযোগ দিচ্ছে আর আপনি কি না যার গেল তার গেল বলে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বসে আছেন? এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যেই আমাদের সমাজ আজ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। যেহেতু আপনার মেয়ে নেই, সেই হেতু অন্যের মেয়ে সম্পর্কে আপনার কোন ভাবনাই নেই। বাট আই টেল ইউ, ওই ফোনে যখন আর একটা মেয়ে আপনার ছেলের কানে প্রেম ঢেলে আপনার খপ্পরের বাইরে নিয়ে গিয়ে গলায় মালাটি পরিয়ে আপনাকে কলাটি দেখিয়ে কেটে পড়বে তখনই বুঝবেন প্রেম কি ফেরোসাস জিনিস! যৌবন উত্তম জিনিস ততক্ষণই, যতক্ষণ বৃদ্ধদের কনট্রোলে থাকে। ঘোড়ার লাগামটি গেল তো সবই গেল।

অফ কোর্স! টেলিফোন হল এমারজেন্সী। আপনার ঘরে সাজিয়ে রাখার খেলনা নয়। সকলকেই ব্যবহার করতে দিতে হবে। কিন্তু সেন্সার করে। সিনেমা, টি ভি, রেডিও, কাগজ শক্তিশালী জনসংযোগ মাধ্যম। কিন্তু! দেয়ার ইজ এ বাট। ভালও করতে পারে খারাপও করতে পারে। সেই জন্যেই সেন্সার। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে বলবে। ছেলে বন্ধু ছেলে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবে। মেয়ে বন্ধু মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু মশয় আমার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলবে, কিংবা আপনি মশয় দুপুরে পরস্ত্রীকে খুঁচিয়ে তুলবেন, সে তো হতে পারে না।

খুব জ্ঞান বেড়ে গেল। এবার থেকে কাউকে টেলিফোনে আর প্রেম করতে দোব না। তিনি যে-ই হোন। অপসংস্কৃতি নট অ্যালাউড। পাশের বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটের ছেলেটি সবে বিয়ে করে আলাদা হয়ে এখানে এসে উঠেছে। মটোরবাইক চালায়। মাস্তান মাস্তান দেখতে। তবে শুনেছি ভাল চাকরি করে। মাঝে মাঝে বউকে পিছনে বসিয়ে ভটভট করে হাওয়া খেতে বেরোয়। সেই বউটি একদিন ঝোড়ো পাখির মত ঘরে এসে ঢুকল, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই একটা ফোন করব। টেলিফোনের কল্যাণে বয়েস

উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, কাকাবাবু, জ্যাঠামশাই, এইবার দাদু হব।

হ্যাঁ বা না-এর তোয়াক্কা কে করে। রিসিভার তোল আর ডায়াল কর। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ফোন করবে? দ্যাট্স-নট ইওর লুক আউট! কানে রিসিভার, আঙুল পাক মারছে ডায়ালে, একটা কলের চার্জ কত? দরকার হয় পয়সা বুঝে নিন বাট ডোন্ট বি সিলি। হ্যালো সেজদি, শোন ভাই রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ধমকের সুরে আমাকে বললে, বাইরে গিয়ে বসুন। ইউ হ্যাভ নো কমান সেন্স। মেয়েদের কথা শুনতে খুউব ভাল লাগে, না! ও পাশের সেজদি বোধ হয় জিজ্ঞেস করেছে, কাকে বলছিস? ঘরের বাইরে যেতে যেতে শুনলুম বলা হচ্ছে, আরে একটা আনম্যানারলি বুড়ো। মুখ দেখলেই মনে হয় কুচুটে। প্রায় ঘণ্টা-খানেক সেজদির সঙ্গে কথা হল। দু-এক টুকরো ভেসে এলো। এই বয়েসেই কান গরম হয়ে ওঠে। মেয়ের সবে বিয়ে হয়েছে। পৃথিবী এখন গোলাপী।

হারাধনবাবুর হোমিও ডাক্তার গড়পারে থাকেন। হারাধনবাবুর শরীরের ওপর রোগের সাঁড়াশি আক্রমণ। রোগ মিলিয়ে এক ওষুধ এনে বসতে না বসতেই আর এক অসুখ প্রবল হয়ে ওঠে। উঠুক না, ক্ষতি কি! আমার ফোন আসায় অসুস্থ মানুষটির কত সুবিধে হয়েছে! ফোনে চিকিৎসা। রুগ্ণ শরীর নিয়ে ট্রাম-বাস বাস-ট্রাম করতে হচ্ছে না। বেঁচে থাকো বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

হ্যালুলো। হ্যাঁ কে ডাক্তার মনোরঞ্জন? ডক্টর মনোরঞ্জন মুখার্জি, এম বি বি এস, এইচ এম বি। না? যাঃ, রঙ নাম্বার হয়ে গেল। তুমি একবার দেখ তো ভাই। বুড়ো মানুষ, কি ঘোরাতে কি ঘুরিয়ে ফেলেছি। বয়েস হয়ে গেলে মানুষের চলে যাওয়াই ভাল; কিন্তু যেতে যে প্রাণ চাইছে না রে ভাই। মায়া, মায়া! আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। প্রথমে ভাবলুম পুত্রবধূর মুখ দেখেছি, আর কি, এবার তো গেলেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না, আর ক'টা দিন, নাতির মুখ দেখে তারপর যেখানে যেতে হয় যাব। এরপর মনে হবে নাতবউ দেখব।

হ্যাঁ—হ্যালো। কে ডক্‌টর মুখার্জি? কথা বলুন।

পেয়েছি বাবা! ফোনটাকে এমন ভাবে দু'হাত চেপে ধরলেন যেন জীবনদণ্ড। হারাধন বলছি। রুগী নম্বর পাঁচ পাঁচ তিন। খাতাটা খুলুন। হ্যাঁ, খাতাটা খুলুন। তেইশ তারিখে ওষুধ এনেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তেইশ। এক পুরিয়া খেয়েছি। খেলে কি হবে!

হারাধনবাবু ফোনে তাঁর বহুবিধ অসুখের এক একটিকে ঝেড়ে ঝুড়ে বের করতে লাগলেন। বিচিত্র সব রোগলক্ষণ। শুনলে গায়ে কাঁটা দিতে থাকে। বেঁচে থাকতে ভয় ভয় করে। বয়েস বাড়তে বাড়তে হারাধন হবার আগেই যেন হাসতে হাসতে কেটে পড়তে পারি প্রভু!

সামনের দিকে তিনখানা বাড়ি এগোলেই এক আদুরে পরিবার আছে। আদিখ্যেতায় ভরা। কর্তা, গিন্নি, একটি ফুটবলের মত বাচ্চা মেয়ে। দোতালার দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট। কর্তা বারান্দার রেলিঙে হাতের ভর রেখে সিগারেট খান। পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং গাউন। কোমরে ট্যাসেলের ফাঁস। শ্যাম্পু করা বাদামী রঙের ফুরফুরে চুল। গোলগাল, ফুলোফালা ঘুম ঘুম মুখ। বারান্দায় কর্তার গায়ে ঠেসান দিয়ে গিন্নি দাঁড়িয়ে থাকেন। পিঠে এলোচুল। হাতকাটা গাঢ় বেগুনী ব্লাউজ। লতাপাতা আঁকা শাড়ির আঁচল বুক থেকে খুলে বারান্দার রেলিঙে শেফালী তোমার আঁচল-খানি বিছাও, শারদ প্রাতের মত লুটিয়ে থাকে। মেয়েটি থাকে দু-জনের মাঝখানে। ইংরেজিতে কথা চলে, ও, নো, নো, বান্টি, সেহেব্যাড নট বার্ড! দ্যাট্‌স আগলি। রাস্তার লোক মুখ তুলে চায়। রাস্তার মাথার ওপর সাইনবোর্ডের মত ঝুলে থাকেন এই সুখী পরিবার। সিগারেট, ধোঁয়া শাড়ি, গাউন, চুল, যৌবন, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা, সব মিলিয়ে আমাদের পথের ধারে—কপোত, কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে।

ওই বেগুনী মহিলা হঠাৎ তাঁর আদুরী মেয়েকে নিয়ে বিকেলের দিকে হাজির। বিলাইতি সেন্টের মন কেমন করানো গন্ধ। মিহি ছুরির মত কথা। করাতকলের কাঠ কাটার সময় যেমন শব্দ হয় সেই রকম শব্দ। এক্সকিউজ মি। কেন এক্সকিউজ কেন? কি করেছেন আপনি? আর কিছু করে থাকলেও, আপনি করেননি

করেছেন আপনার স্বামী। ওভাবে রাস্তায় জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ছোঁড়া উচিত নয়।

ও, নো নো, সে এক্সকিউজ নয়। এ হল কথার কথা। অ্যাংলো বেঙ্গলী সমাজের রীতিই হল, কথা শুরু করার আগে এক্সকিউজ মি বলা। ধাক্কা মেরে চলে যাবার সময় বা এগিয়ে যাবার সময় এক্সকিউজ মি বলা। পা মাড়িয়ে দিয়ে, সুটকেসের খোঁচা মেরে চোখে আঙুল গুঁজে দিয়ে সরি বলা। ভদ্রসমাজের নিয়মই হল, সরি বললে সাতখুন মাফ। আমার হাত ফসকে একবার একটা ফুলগাছের টব রাস্তায় এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়ে গিয়েছিল। দোতলা থেকে পড়েছে। আমি বুঝতে পারছি ঘাড়ে পড়বে, ভীষণ লাগবে। চিৎকার করে তিনবার বললুম, সরি, অ্যাম সরি, ড্যাম সরি। রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেল। চিৎকার, চেঁচামেচি, সাংঘাতিক ব্যাপার। অশিক্ষিতের দেশ তো। ম্যানারস জানে না। আদব কায়দা জানে না। আমি তখন খুব রেগে গিয়ে বললুম, আন্তর্জাতিক নিয়ম জানেন না আপনারা, সরি বলার পর আর কিছু করার থাকে না। যান, ভদ্রলোককে হাসপাতালে নিয়ে যান। নেহাত অজ্ঞান হয়ে গেছেন তাই জ্ঞান থাকলে উনিও বলতেন, সরি, সরি। আফটার সরি দেয়ার শুড বি নো ওয়ারি। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস জেনে রাখুন, হঠাৎ হেঁচে ফেললে সরি বলতে হয়। আমার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে বাথরুমে হেঁচে ফেললেও সরি বলি। এটা হল সেই এক্সকিউজ মি।

এক্সকিউজ মি?

এ মা! কি বোকা? আপনি এক্সকিউজ মি বলবেন না। আপনি হাসি হাসি মুখে শুধু শুনে যাবেন।

আমি মুখে হাসি মেখে শুনতে লাগলুম, তিনি বলতে লাগলেন—

আমার এই মেয়েটা বাবাকে ছেড়ে এক মিনিটও থাকতে পারে না। কি মুশকিল বলুন তো? এক ধরনের ফাদার কমপ্লেক্স।

তা আমাকে কি করতে হবে?

না না, ও রকম রুডলি কথা বলবেন না। একজন মহিলার

সঙ্গে নরম গলায়, হেসে হেসে, ওবলাইজিংলি **কথা বলতে হয়।** চোখের দৃষ্টিতে একটা সপ্রেম ঝিলিক থাকবে।

চোখে প্রেমের ঝালর ঝুলিয়ে বললুম, বলুন কি করতে পারি? এই মেয়ে তিনবার আসবে, একবার বারোটার সময়, একবার তিনটের সময়, একবার ছ'টার সময়। আপনার ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলবে। ক'টা দিন। তারপর তো আমরা কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টারে চলে যাব। বান্টি। বা-আ-ন্টি? কাম হিয়ার: ওই যে *ফোন। টু থ্রি ফোর নাইন। মুকার্জি প্লিজ। মুকু! এই নাও তোমার* আদরের মেয়ে। কি মেয়েই যে হয়েছে বাবা! শোনো তুমি বাপু চাকরি-বাকরি ছেড়ে দাও। মেয়ে কোলে নিয়ে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকো। আমি আর পারছি না বাবা! অ্যাঁ, কি বললে! আমার মেয়ে! আমার মতই হবে! ও নো, নো, অসভ্যতা কোরো না।

সেই মেয়ে। যেমন একগুঁয়ে তেমনি বায়নাদার। ফোন ধরলে আর ছাড়তে চায় না। কেড়ে নিতে গেলে চিল চেঁচায়, খ্যাঁক খ্যাঁক করে কামড়ে দেয়। বুকের কাছে দু'হাতে রিসিভার চেপে ধরে দেয়ালে পিঠ ঠেসে ঘাড় কাত করে বলে, আমার ফোন, আমার বাবার ফোন।

এই হল আমার বাঁশ নম্বর এক। আজকাল মাঝে মাঝেই মাঝরাতে অন্ধকার বসার ঘরে থেকে থেকে ফোন বাজে। আমি জানি কে? একটি বৃদ্ধ মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে। নাম নেই ধাম নেই, যেন প্রেতকণ্ঠ!

হ্যালো! কি হল আজও ঘুম আসছে না?

না। তুমিও তো দেখছি জেগে আছ!

আমারও যে আসছে না।

আসবে না ভাই, ঘুম আর আসবে না। আমাদের দিনের পাপ যত বাড়ছে রাতের বিবেক তত আসছে।

কেমন হল?

কি কেমন হল?

ময়দানে খেলার নাম নরবলি। চোদ্দটা তাজা প্রাণ চলে গেল। সংবাদ বিচিত্রায় অজয়ের বাবার আর্তচিৎকার শুনেছো?

শুনেছি।

বল, ঘুমনো যায়? জেগে থাক, জেগে থাক! সজাগ থাক। ঘুমোলেই মরবে! নাগিনীরা ফেলিতেছে চারিদিকে বিষাক্ত নিশ্বাস।

পি. এ

উচ্চতায় মাঝারি।

বর্ণে, শ্যাম।

মুখশ্রী, কখনও ভয়াবহ, কখন অম্ল-মধুর, কখনও প্রেম প্রোজ্জ্বল।

আচরণে, নেকড়ে-বাঘ সদৃশ্য।

এবম্বিধ গুণসম্পন্ন মানুষটি মন্ত্রী না হয়ে অন্য কিছু হলে বেমানান হত। বিধাতার আশীর্বাদে ইনি মন্ত্রীই। এবং চুনোপুঁটি নয়, বেশ ভারি মন্ত্রী। দপ্তরে এঁর কটুকাটব্যে তটস্থ। ইনি স্বভাবে ব্লটিং-পেপার সদৃশ। যে কোনও মুখের হাসি সহসা মুছে দিতে পারেন। যে কোনও চোখে জল এনে দিতে পারেন। যে কোনও সংসার উদার দাক্ষিণ্যে জমজমাট করে দিতে পারেন যেমন, তেমন যে কোনও সংসারের ভিটেয় জোড়া ঘুঘুও চরিয়ে দিতে পারেন। ইনি কখনও ঝরা কখনও খরা।

'আমায় ভয় পায়' এই ভেবেই তাঁর আনন্দ। 'আমি টেরিবল' এই প্রসাদগুণেই ইনি সুখ্যাত। এ হেন একজন দুরন্ত মন্ত্রীর দপ্তরে শ্যামাচরণ পি. এ. হবার সৌভাগ্য নিয়ে আদি সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল উনিশশো ছত্রিশ সালে কোনও এক মাসে। তখন সে জানত না তার ভাগ্যে কী লেখা আছে। যখন জানল তখন আর পালাবার পথ নেই। বঙ্কিমবাবু বি এ পাশ করে ডেপুটি হয়েছিলেন। শ্যামাচরণ বিশ্ববিদ্যালয় গুলে খেয়ে এ দপ্তর সে দপ্তরে

হাতফেরতা হতে হতে খোদ মন্ত্রীর দপ্তরে পি. এ. হয়ে বসেছে। সিনিয়াররা বললেন, বরাত তোমার ভাল শ্যামাচরণ। হলে খুব হবে, না হলে হেলে পড়বে। জিনিসটা বেশ ভালই। ট্যাকল করতে পারলেই টাকা। না পারলেই ফাঁকা। সার্কাসের সেই তন্বী মহিলাটিকে স্মরণ কর, যে বীরাঙ্গনা সিংহের গলা জড়িয়ে ধরে গোঁফে চুমু খায়। এও সেই একই পদ্ধতি—টেমিং এ লিও।

সার্কাসের সিংহ আফিমের মৌতাতে থাকে। মন্ত্রী থাকেন ক্ষমতার টাটে। বিলিতি কোম্পানির ঘূর্ণায়মান ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর চেয়ারে। গদির ওপর গদি (পশ্চাদ্দেশ বড়োই স্পর্শকাতর)। সামনে অশ্বক্ষুরাকৃতি ডবল ডেকার টেবিল। ঝকঝকে চকচকে। ব্র্যাসো দিয়ে মাজা পেতলের পেপারওয়েট মুন্ডিতোলা সারি সারি। যেন ক্ষমতার বোতাম। মেজাজের মুরগি ঘড়ি। ঠকাস্ ঠকাস্ করে ঠুকে কাগজে চাপা দিলে অরডারলি পিওন বুঝতে পারে মালিক কাপুরের মেজাজ চড়ে আছে। টুকুস টুকুস করে নাড়াচাড়া করলে বুঝতে পারে মন্ত্রী মহোদয় এখন খেলোয়াড়ী মেজাজে আছেন। ঘরজোড়া নরম কার্পেট। পা ডুবে যায়। প্রিয়দর্শিনী টেলিফোনের সারি। কখনও একটা বাজে কখনও সবকটা কোলের শিশুর মত ককিয়ে ওঠে। ফোন বাজার দাপট দেখলে দেশের পরিস্থিতি বোঝা যায়। যখন মৃদু মৃদু একটি কি দুটি রিরিরিং রিরিরিং করে, তখন বুঝতে হবে বিরোধীরা শান্ত, লাশটাশ তেমন পড়ছে না, ঝান্ডা তেমন উড়ছে না, মিছিল রাজপথে তেমন পাক মেরে মেরে ঘরমুখো অফিস যাত্রীদের পাক-দন্ডীতে বেঁধে ফেলছে না, বিধানসভায় জুতো ঝাঁটা লাথি চলছে না। শিবিরে শিবিরে বিরাজ করছে সমঝোতার শান্তি। ফোনে তখন প্যানের প্রেমের বুলি। কিন্তু লাল, গোলাপী, নীল সবকটাই যখন তেড়েফুঁড়ে বাজতে থাকে, যখন এ কানে একটা ও কানে একটা, দু'কাঁধে দুটো সরব সপ্তগ্রামে, তখন বুঝতে হবে গেল গেল অবস্থা। গদি করে টলটল, পাসরাতে ওঠে জল।

আজ সেইরকম একটা দিন। মন্ত্রীর কানে লাল টেলিফোন। তিনি খ্যাস-খ্যাসে গলায় ও প্রান্তের মানুষটিকে বেজায় ধমকাচ্ছেন। কারণ তিনি মনে করেন—তিনি জনতার প্রতিনিধি। ঠান্ডা ঘরে

কাঁচ মোড়া টেবিলে টাট সাজিয়ে বসে থাকলেও তিনি আছেন মৃত্তিকার কাছাকাছি, তাঁদের সেবক দাসানুদাস হয়ে।

মন্ত্রী বলছেন—দাঁত মেলছো মনে হচ্ছে। (ও প্রান্তে যিনি তিনি বোধ হয় হেঁ হেঁ করে হাসির ভাব এনেছিলেন কথায়। ডাক্তারী ভাষায় এ ব্যাধিকে বলে গ্রেট ম্যান প্রক্সিমিটি রিফ্লেকস। অনেকের যেমন বাইরে যাবার নাম শুনলেই নিম্নবেগ আসে। বড় মানুষের সামনাসামনি হলেই অনেকে অজান্তেই হাত কচলাতে থাকেন আর গলা দিয়ে হেঁ হেঁ করে বিচিত্র শব্দ ক্ষেপণ করতে থাকেন। মুখের চেহারা হয় কুমোরের তৈরি কাঁচা মুখ। মাটিতে জোর করে থেবড়ে বসিয়ে দিলে যেরকম হবে, সেই রকম) ওই দাঁত আমি একটা করে খুলে স্যাপারেট পার্সেল করে তোমার বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দোব হারামজাদা। মালা করে পরবে। মানকে! মানকে বড় না আমি বড় শুয়োর? মন্ত্রী সেই ভদ্র সন্তানকে শুয়োর বলে ঝপাং করে ফোন ফেলে দিয়ে পায়ের কাছে বোতামে চাপ দিলেন।

শ্যামাচরণের মাথার ওপর লাল আলো দুরদুর করে জ্বলে উঠল। শ্যামাচরণ স্টেনোর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল, হাসি ফিউজ হয়ে গেল। পেটে মৌরলা মাছের ঝোল পাক খেয়ে উঠল অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মত। (শ্যামাচরণ হালে বিয়ে করেছে। নতুন বউ স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্য ইদানীং বঙ্গসন্তানটিকে মৌরলা মাছের ঝোল সেবন করাচ্ছেন। মন্ত্রীর পি. এ। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্মৃতি আর শ্রুতির ওপর। মন্ত্রীর নেকনজরে হয় প্রোমোশন না হয় লিকুইডেশান। এখন স্বামী আমার রংচটা পতপতে তেরপল ঢাকা জিপে চেপে অফিস যায়। মই বেয়ে আর একটু উঠতে পারলেই মটর গাড়ি। ফোন হবে, ফ্রীজ হবে, ট্যুর হবে, টি এ হবে)।

শ্যামাচরণ হিলহিলে ঠান্ডাঘরে ঢুকল। মন্ত্রী তখন দু দাঁতের মাঝে একটা টুথপিক ধরে তিরতির করে নাচাচ্ছেন! টেবিলের ওপর হাতের চেটো আঙুল নিয়ে খেলছে। শ্যামাচরণ ঢুকতেই মন্ত্রী টেনে টেনে বললেন—শুয়োরের বাচ্চা।

শ্যামাচরণ বলল—ইয়েস স্যার। (কেরিয়ার গাইড বলছে—ডোন্ট প্রোটেস্ট এ মিনিস্টার। অ্যাকসেপ্ট এভরিথিং অ্যাজ অমৃতং কালমন্ত্রী ভাষিতং)

মন্ত্রী বললেন—বাঁশ দোবো। আছোলা বাঁশ।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : দিল্লী থেকে বাঁশ আনব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : ইউ আর এ ফুল।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : আজই আমি দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার (কেরিয়ার গাইড বলেছে, ট্যাকল এ মিনিস্টার উইথ লিমিটেড ভোকাবুলারি। প্লে ক্লেভারলি উইথ টু ওয়ারড্স—ইয়েস অ্যান্ড স্যার। প্লেস ইট বিফোর, প্লেস ইট আফটার, পাঞ্চ ইট হিয়ার, পাঞ্চ ইট দেয়ার অ্যাজ অফন অ্যাজ ইউ গেট ইওর চানস। হোয়েন ইউ লিভ দেয়ার শুড রিমেন নাথিং বাট ইয়েস অ্যান্ড স্যার)।

মন্ত্রী : কিসে যাব?

শ্যামাচরণ : প্লেনে নয় স্যার, ট্রেনে।

মন্ত্রী : কেন ট্রেনে?

শ্যামাচরণ : অ্যাস্ট্রলজার অ্যাডভাইস করেছেন স্যার প্লেনে স্যার গেলে স্যার অ্যাকসিডেন্ট হবে স্যার।

মন্ত্রী : রাজধানীর টিকিট চাই। দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও এখুনি জোগাড় কর। (সুর করে) ইডিয়েট।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

প্যান্টটাকে ভুঁড়িতে বেল্ট ধরে টাইট করে শ্যামাচরণ চু কিত কিত করে ছুটল রাজধানীর টিকিট জোগাড়ে। ভি আই পি কোটা বললেই তো হল না, ভি আই পি-র সংখ্যা কম নাকি? একটা ট্রেন, অনেক ভি আই পি। শ্যামাচরণের মন্ত্রী অন্যের তো তিনি মন্ত্রী নন। হু কেয়ারস হুম? তোমার মন্ত্রী তুমি মাথায় করে দিল্লী নিয়ে যাও। এ যেন তোমার বউ তুমি ম্যাও সামলাও! শ্যামাচরণ অতি কষ্টে কান ধরে ওঠ বোস করে পাঁচটা সিমেন্টের টোপ ফেলে একটা টিকিট ম্যানেজ করল। কেরিয়ার গাইড বলছে স্ত্রীকে এবং মন্ত্রীকে জীবন দিয়েও সন্তুষ্ট রাখবে। আর প্রমিস? প্রমিস ইজ এ থিং হুইচ ইউ আর নেভার এক্সপেক্টেড টু ফুলফিল।

মন্ত্রীদের কেরিয়ার তো অঙ্গীকারের শত শত মৃত স্তূপের ওপরেই হাসছে, খেলছে, ভাঙছে, জুড়ছে।

মন্ত্রী বললেন, টিকিট পেয়েছ ?

শ্যামাচরণ : পেয়েছি স্যার।

মন্ত্রী : সিকিউরিটিকে জানিয়ে রাখ। আমার ব্যাগেজ রেডি কর।

জনতার সেবক হলেও জনতা মন্ত্রীর সেবক নাও হতে পারেন। হাতের কাছে হ্যাণ্ডি কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মেরে দিতেও পারে। তখন ? ক্ষতি তো দেশেরই হবে। মন্ত্রীর আর কি ? তিনি মরে ভূত হবেন। কে বলে মন্ত্রীর উপদ্রবের চেয়ে ভূতের উপদ্রব ভাল ! তাদের কোনও ধারণা নেই। শ্যামাচরণের আছে। সে দেখেছে কোনও মন্ত্রী তাঁর পি এ-কে মনে মনে অথবা সশব্দে একশো আট বার মনুষ্যেতর প্রাণীতে সম্বোধন করলেই একটি প্রোমোশন। তার অর্থ কি তাহলে দুধ মেরে যেমন ক্ষীর পশুত্বে ঘন হলেই একটি উচ্চপদ ? শ্যামাচরণ চা খেয়ে চেয়ারে চিৎিয়ে পড়ল। ভুঁড়িটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

এদিকে বেলা বাড়ছে। আকাশে ঘন মেঘ। এল বুঝি বৃষ্টি। লাঞ্চের সময় শুরু হল শহর ভাসানো বৃষ্টি। মন্ত্রী আর পি. এ যখন রাস্তায় নামলেন তখন রাজপথের যা অবস্থা, তাতে আর মটর নয় স্পিডবোট চলতে পারে।

মন্ত্রী তাল ঠুকে বললেন, তোমাদের ষড়যন্ত্র।

শ্যামাচরণ ইয়েস স্যার বলতে গিয়েও সামলে নিল। নো স্যার।

মন্ত্রী : তোমরা জানতে আমি আজ দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : তবে নো স্যার বললে কোন আক্কেলে, অ্যাঁ। খোদার খাসি।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : তোমরা আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে যে ভাবেই হোক। আই মাস্ট ক্যাচ দি ট্রেন।

মন্ত্রী উঠলেন গাড়িতে। পেছনের আসনে তিনি। সামনে সিকিউরিটি আর পি. এ শ্যামাচরণ। গাড়ি চলছে স্টেশনের দিকে।

মন্ত্রী ড্রাইভারকে ধমকাচ্ছেন ট্রেন যদি ধরাতে না পারিস তোকে আমি বিরোধী বলে বরখাস্ত করবো। ষড়যন্ত্র। আই নো হু আর বিহাইণ্ড দিস। এর পেছনে আমার দলের ফ্র্যাকসান আছে আর আছে অপোজিশান। ড্রাইভার মনে মনে বললে, সব করবি শালা। আজ আছিস কাল নেই। শ্যামাচরণ বললে, অপোজিশান হল ঈশ্বর স্যার। মন্ত্রী শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা জপ করতে করতে পুরমন্ত্রীর মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। জপাৎ সিদ্ধি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মনে হল সারা শহরে এক হাঁটু নোঙরা জলে থই থই করছে পালপাল শূকর। একটি দাড়িঅলা শূকর একটা লরি চালিয়ে তাঁর গাড়ির সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রী ড্রাইভারকে বললেন, সাইরেন লাগাও। হঠাৎ তাঁর মনে হল গাড়ির সামনে পতাকা লাগানো হয়নি। হোয়াই। ষড়যন্ত্র। শ্যামাচরণ! গো। গেট দি ফ্ল্যাগ। রাসকেল।

ভগবান বাঁচালেন। ফ্ল্যাগ গাড়িতেই ছিল। এক কোমর জলে নেমে শ্যামাচরণ পতাকাদণ্ডে পতাকা পরালেন। ঘন ঘন সাইরেন, দণ্ডে জলে ভেজা পতাকা, মন্ত্রীর শূকরোক্তি, সিকিউরিটির চড়চাপড় কোনও কিছুতেই জ্যাম খুলল না। মন্ত্রী মনে মনে তিনজন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে ফেললেন। তার মধ্যে সাদা বর্ষাতি মোড়া ট্রাফিক পুলিশটিও পড়ল। পুরমন্ত্রী যে তার অ্যান্টি গ্রুপে, সে সত্যটিও জলমগ্ন রাস্তায় গাড়িতে বসে তাঁর খেয়াল হল। মনে মনে বললেন আই উইল সি। সি শব্দটি মনে আসতেই হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। শ্যামাচরণ?

ইয়েস স্যার।

নেমে পড়।

শ্যামাচরণ জলে নামল। নেমেই বুঝল চার্কারির জল কত ঘোলা।

মন্ত্রী—দৌড়ও। তুমি দৌড়ে ট্রেন ধরে রাখো। গার্ডকে বল মিনিস্টার আসছেন গোও।

শ্যামাচরণ সেই হাঁটুজলে হাঁচর পাঁচর করে দৌড়তে শুরু করল। উঃ! ভুঁড়িটাই এখন দেখছি কাল হল। লরির ফাঁক গলে, ট্রামের পাশ দিয়ে, রিকশার কোল গলে খানাখন্দ পেরিয়ে পি. এ ছুটছে।

হাওড়া স্টেশন। গার্ড সাহেব বাঁশি মেরেছেন। পতাকা ঝটাপট করছে। ট্রেন ছাড়ল বলে। কাকভেজা একটি লোক ইঞ্জিনের চেয়েও বেশি হাঁপাতে হাঁপাতে সটান তার পায়ে এসে পড়ল।

শ্যামাচরণ : স্টপ, স্টপ, মিনিস্টার ইজ কামিং।

গার্ডসাহেব তলায় পড়ে থাকা মানুষটিকে দেখলেন। প্ল্যাটফর্মেও পুলিশের আয়োজন ছিল, যেহেতু মন্ত্রী যাবেন। শ্যামাচরণ জ্ঞান হারাবার আগে পরিষ্কার বাংলায় বলল, বাঁচান, গাড়ি থামান, মন্ত্রী আসছেন। আমি তাঁর পি এ।

গাড়ি লেগে রইল। পুলিশ তৎপর হলেন। আসছেন, তিনি আসছেন। কামরায় কামরায় অসন্তুষ্ট যাত্রী। কে হরিদাস পাল। অবশ্য তাঁরা জানতেই পারলেন না, কেন ট্রেন ছাড়ছে না। গার্ডসাহেব বললেন টেকনিক্যাল প্রবলেম।

হঠাৎ পুলিশবাহিনী সজাগ হয়ে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। একটি মাঝারি উচ্চতার পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষ গটগট করে এগিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। পি. এ শ্যামাচরণ সবে তখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফাইলে নোট লেখার ভাষায় বললে—ডান স্যার, অ্যাজ ডাইরেকটেড।

মন্ত্রী চলমান গাড়ির জানালা থেকে স্নেহের গলায় বললেন, আই উইল সি।

উপসংহার : সত্যিই তিনি দেখেছিলেন। শ্যামাচরণ মাছের মত জল কাটতে পারে। হি হ্যাজ প্রুভড ইট। শ্যামাচরণকে মৎস্য বিভাগের উচ্চপদে রেখে মন্ত্রী আই উইল সি করলেন। শ্যামাচরণ-দম্পতি সেই প্রবাদবাক্যের বিপরীত উদাহরণের মত লেখাপড়া শিখেও মৎস্য ধরিতে লাগিলেন এবং সুখে খাইতে লাগিলেন দীর্ঘকাল। আর মন্ত্রী মহোদয় নির্বাচনে গভীর জলে তলাইয়া গেলেন।

সাইডিং

টেলিফোনের সময় সোমনাথ বললে, 'আমার মনে হয় যূথিকা তোর প্রেমে পড়েছে।'

যূথিকা আমাদের নতুন টাইপিস্ট। এই মাসখানেক হল চাকরি পেয়েছে। শ্যামবর্ণ কিন্তু মুখটি ভারি মিষ্টি দেহটিও মন্দ নয়। না লম্বা, না বেঁটে। মাথায় অনেক চুল, তা না হলে অত বড় খোঁপা হয় কি করে। চোখে সোনালী ফ্রেমের ফিনফিনে চশমা। হাসলে গালে টোল পড়ে। সামনে দিয়ে চলে গেলে হৃদয়ে দোলা লাগে। অফিসে আরও মেয়ে আছে, তবে তাদের কেউ না কেউ দখল করে বসে আছে। যেমন সোমনাথ রেবাকে। একমাত্র যূথিকাই ফ্রি আছে। আর অপর পক্ষে আমরা দুজন, আমি আর বিধান। বিধানের সম্প্রতি ফ্লু হয়েছে। অফিসে আসছে না।

'কি করে বুঝলি ?'

'টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝেই তোর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

আমি যেখানে বসি তার পেছনেই বিশাল একটা জানালা। সেই জানালায় হাওড়ার পোল আটকে আছে। যূথিকা হয়ত পোলটাই দেখে! মেয়েরা অত সহজে প্রেমে পড়বে বলে বিশ্বাসই হয় না। বহুত কাঠখড় পুড়িয়ে তবে প্রেম! প্রেম কি যাচিলে মেলে, আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।

'আমার দিকে তাকায় না, আমার পেছনের হাওড়ার পোলের দিকে তাকায়।'

'তোর দিকেই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেমন ঘাবড়ে যায়।'

'ঠিক বলছিস?'

'ডেড সিওর।'

হতেও পারে। সোমনাথ ভেটারেন প্রেমিক। প্রেম কা কাচেচ হিন্দি ছবিতে এইরকমই যেন কি একটা বলে। মেয়ে-ছেলে এক্সপার্ট। মেয়েদের চোখে চোখ রেখে মনের গভীরে ঢুকে যেতে পারে। কথায় বলে, এই সংসার-সমুদ্রে এমন কোন মেয়ে নেই যাকে আমার চারে ভেড়াতে না পারি। বলে বলে লটকে আনব।

সেই সোমনাথ যখন বলছে তখন সত্যিই হয়ত যূথিকা আমার প্রেমে পড়েছে।

'আমার এখন তাহলে কি করা উচিত!' প্রশ্নটা করে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল! মেয়ে যেন প্রথম গর্ভবতী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইছে।

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বললে, 'নট ব্যাড। মেয়েটা ভালই। পটাতে পারলে সহজেই পটবে। তবে প্রেম আর মামলা মকদ্দমা একই নেচারের জিনিস। সময় দিতে হবে। ভাল খেলোয়াড়ের মত খেলতে হবে, খেলাতে হবে। তোকে একটু স্মার্ট হতে হবে। এই ম্যাদামারা, ভিজে বেড়াল ভাবটা সামলাতে হবে। বি এ সোডা ওয়াটার বট্‌ল। মুখ খুললেই ভাব আর ভাষার গ্যাঁজলা বুজবুজ করে বোরোতে থাকবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো এখনও মুখোমুখি হয়নি। চোখাচোখি হয়েছে বললেও ভুল হবে। চোখা হয়েছে চুখি হয়নি।'

'দ্যাট্‌স ট্রু। তোমার সেই চোখকে এবার কায়দা দেখাতে হবে। চোখে চোখ মারতে হবে।'

'ছি ছি ছি চোখমারা খুব গর্হিত কাজ, লোফারদের কাজ। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে আছে সে চোখ মারে বলে তার নামই হয়ে গেছে চোখমারা মিনু। ও ভাই আমি পারব না। ভীষণ শক্ত কাজ। একটা চোখ রেখে আর একটা চোখ পিচিক করে বোজানো।'

'আরে সে চোখ মারা নয়। এ হল নজরো কা তীর মারে কষ

কষ এক নোহি, দো নোহি, আট নও দশ। স্ট্রেট তাকিয়ে থাকবি প্রেমিকের পাওয়ারফুল দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দের চোখ, মজনুর হৃদয় এই হল প্রেমিকের অ্যানাটমি।'

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলছি। চা দিয়ে গেছে চা খাচ্ছি। ওদিকে আমাদের আলোচনার সাবজেক্ট উল্টো দিকের দু সার টেবিলের ওপারে বসে খুটুস খুটুস করে টাইপ করে চলেছে। সোমনাথের কথা শোনার পর আমি একবারও ওদিকে তাকাইনি। যূথিকার পাশে বকুল, বকুলের পাশে রমা, রমার পাশে আশা। সারি সারি যুবতী, যৌবন যায় যায় এমন সব মহিলা। সকলেরই কিছু না কিছু অ্যাফেয়ারস আছে।

সোমনাথ বললে, 'তোর ড্রেসটাও পালটাতে হবে। এই মাল-কোঁচা মারা ধুতি আর দাদু মার্কা শার্ট চলবে না। কেমব্রিকের পাঞ্জাবি গোটা চারেক বানা। স্ট্রিমলন্ড্রিতে কাচাবি। তিন দিনের বেশি পরবি না।'

'বেশ কস্টলি হয়ে যাবে না!'

'তা একটু হবে ভাই। প্রেম আর ব্যবসায় ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কিছু থাকবেই। বিনা পয়সায় হয় না। সে হয় মেয়েছেলেদের। মেয়েরা হল রিসিভার। আমরা দিয়ে যাব, ওরা নিয়ে যাবে।'

'কি দেবে?'

সোমনাথ বেমক্কা প্রশ্ন শুনে রাগ রাগ মুখে তাকাল।

'তুমি শালা জানো না কি দেবে। যা দেবার তাই দেবে। প্রেম পাকলে বিয়ে হবে। বিয়ে হলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবি, লাভ ম্যারেজ! লাভ ম্যারেজে একটা ছেলের ইজ্জত কত বেড়ে যায় জানিস! লাভার হল হিরো, টক অফ দি টাউন।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। প্রেম এবং বিবাহ। প্রেম জিনিসটা মন্দ নয়; কিন্তু বিয়ে! যূথিকার সঙ্গে বিয়ে মানে অসবর্ণ বিবাহ। মেরে ফেলবে। বাড়ি থেকে লাথি মেরে দূর করে দেবে। ত্যাজ্য-পুত্তুর করে দেবে। আমার কোষ্ঠিটাও আবার তেমন ভাল নয় বদনামের যোগ আছে। চরিত্র নাকি চোট খাবে।

'আচ্ছা সোমনাথ, শুধু প্রেম হয় না ভাই, বিয়ে ফিয়ে বড়ো ঝামেলার ব্যাপার। ওটা অ্যাভয়েড করা যায় না?'

'যায়, তবে কিছু স্টিকি মেয়ে আছে, আঠাপাতার মত গায়ে লেপটে যায়, ছড়ান যায় না।'

'যূথিকাকে তোর কি মনে হয়!'

'আর একটু স্টাডি করে বলব। তবে জেনে রাখ, প্রেমে অনেক হোঁচট থাকে। কটা প্রেম ম্যাচিওর করে রে! হাতে গোনা যায়। আমাদের ইনসিওরেন্সের মত। প্রিমিয়াম ল্যাপস করবেই। কেস ক্যাচ। ভেরি ডিফিকালট সাবজেক্ট। মেয়েরা প্রথম প্রেমে ধাত পাকায়, দ্বিতীয় প্রেমে খেলা করে, তৃতীয় প্রেমে দাগা খায়। তারপর যখন দেখে যৌবন যায় যায়, তখন নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে পড়ে। বিয়ের ভয়ে পেছিয়ে যাসনি। সিমটম যখন দেখা গেছে তখন ব্যাপারটা নিয়ে একটু ড্রিবল কর।'

'কী ভাবে করব, বলবি তো?'

'তুইও কাজ করতে করতে যখন তখন তাকাবি। চোখে চোখ ঠেকলে উদোবঙ্কার মত ভয়ে চোখ নামিয়ে নিবি না। ধরে রাখবি, আস্তে আস্তে সময় বাড়াবি। চোখে হাসবি।'

'চোখে হাসব কি করে! লোকে তো মুখেই হাসে।'

'আজ্ঞে না স্যার। প্রেমিকের হাসি চোখে। রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবি।'

'ভয় করে।'

'কি ভয় করে? কাকে ভয় করে? ভয়ের কি আছে রে। প্রেমে আর রণে ভয় পেলে চলবে না।'

'আমাদের পাড়ার মধুকে একটা মেয়ে একবার জুতো মেরেছিল। মধুর অপরাধ সে মেয়েটাকে দেখলেই মুচকি মুচকি হাসত।'

'মধু ইডিয়েট।'

'ইডিয়েট! কেন ইডিয়েট!'

'প্রথমে চোখে চোখে সইয়ে নিয়ে তারপর হাসতে হয়। দেওয়ালে পেরেক ঠোকা। প্রথমে ঠুকুর ঠুকুর তারপর ঠকাস ঠকাস।'

'যদি আবার ঠকে যাই!'

'ঠকে যাই মানে?'

'এই তো তিন চার দিন আগে। আমি যাচ্ছি, উলটো দিক থেকে একটা মেয়ে আসছে। পাড়ারই মেয়ে। মুখ চেনা হঠাৎ হাসল

আমি হাসলুম। আমি হাসতেই তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। খুব নার্ভাস হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে। পেছন ফিরে তাকালুম। আমাকে দেখে হাসেনি। সে হেসেছে আমার পেছনে একটা ছেলে আসছিল তাকে দেখে। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল মাইরি! আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে কি হয়েছিল! মেয়েটা এত নিষ্ঠুর। কুকুরের মত। ওয়ান মাস্টার ডগ।'

সোমনাথ সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'ও রকম একটু আধটু মিসফায়ার হবেই। ভাল শিকারীর বন্দুক থেকেও মাঝে মধ্যে শিকার ফসকে যায়। প্রেমের পেছনে চোখ নেই। সাকসেসের রাস্তা হল লিপ বিফোর ইউ লুক। জহরব্রতের মত, জয় মা বলে ঝাঁপ মার আগুনে।'

সোমনাথ মেয়ে মহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। যূথিকা বকুলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। একদিন আমার সঙ্গেও হয়ত হেসে হেসে ওই ভাবে কথা বলবে! জলজ্যান্ত একটা মেয়ে। চুল, খোঁপা, আঁচল। ভাবা যায় না! ভেতরটা কিরকম গুড়ুগুড়ু করে উঠছে। প্রেমের উপন্যাসে যা পড়েছি তা এবার সত্য হবে। হবে তো?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে ধরে সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। আমার মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কী দেখছে রে বাবা? লোকে হাত দেখে, কপাল দেখে, মুখ দেখে। মাথা দেখে বলে জানা ছিল না। সোমনাথ অ্যাসট্রলজি করে শুনেছি। অবশ্য নিজেও কখনও সামনে হাত ফেলে পরীক্ষা করে দেখিনি, অ্যাসট্রলজি না হোয়ারোলজি!

সোমনাথ হাতের একটা আঙুল আমার চুলে ঠেকিয়েই চাটনি চাখার মত করে তুলে নিল। 'ইস ছি ছি, তুই চুলে তেল মাখিস? থার্ডক্লাস। কবে যে তুই মানুষ হবি! নো তেল। চুলে তেল মেখে প্রেম হয় না। প্রেম হল ফুরফুরে ব্যাপার। চুল ফুরফুরে, মন ফুরফুরে, প্রেম ফুরফুরে।'

সোমনাথ চলে গেল। আজ আবার ময়দানে খেলা। খেলার মাঠে যাবে। ঠিক ম্যানেজ করে অফিস কাটবে। আমাদের অত সাহস নেই। সাহস না থাকলে পৃথিবীতে কিছু করা যায় না।

ক্রীতদাস হয়ে ফাইল রগড়াও। একবার আড়চোখে যূথিকার দিকে তাকালুম। তা আমার দিকে তাকিয়ে নেই। মাথা নিচু করে টাইপ করছে? কানের দুল নড়ছে টিনিটিনি করে। কে কার প্রেমে পড়েছে? আমি যূথিকার না যূথিকা আমার। ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়।

টিফিনের পর দেখা গেল। ছোট্ট লেডিজ রুমাল বের করে ঠোঁটের ঘাম মুছতে মুছতে যূথিকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মাথা ঠোকাঠুকির মত চোখে চোখে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলুম। চোখ নামালেও মন-ঘুড়িটা যূথিকার আকাশেই লাট খেতে লাগল। কমলালেবু রঙের শাড়ি পরেছে। সাদা ব্লাউজের হাতা ওপর বাহুতে খাপ হয়ে বসে আছে। একপলকের দেখা। কি জানি, আমাকে দেখছিল, না আমার পেছনে আকাশের টঙে হাওড়ার পোলের সদ্য রঙকরা ঝালমলে মাথা? সোমনাথ বলে যায়নি কতক্ষণ অন্তর দেখা উচিত। পরের বার যখন চোখ তুলে তাকালুম যূথিকা নেই। শূন্য চেয়ার। ধার তেরিকা, গেল কোথায়? এখন তো সবে তিনটে। ছুটি হতে পাক্কা দুঘণ্টা বাকি। এর নাম প্রেম। গঁদের আঠার মত চেয়ারে যদি আটকেই না রইল তাহলে আর প্রেম হল কি! বড়ো অভিমান হল। সোমনাথ বলার পর থেকে আমি একবারও সিট থেকে উঠিনি! সামান্য অদর্শনে প্রেম যদি চটকে যায়? সব সময় চোখের সামনে নিজেকে হাজির রেখেছি। দুয়ারে খাড়া এক যোগী। ধুর, প্রেম ফ্রেম সব ফল্‌স। আসলে ক্লান্ত চোখটাকে নীল আকাশে একটু খেলিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকাবে কেন? আমি কি সিনেমার হিরো! মেয়েরা হয় হিরোর প্রেমে পড়ে, না হয় ভিলেনের আমি তো কোনোটাই নই। মাছি মারা কেরানি।

॥ দুই ॥

আমার একটু সকাল সকাল অফিসে আসা অভ্যাস। বাসে-ট্রামে ভিড় কম থাকে। তাছাড়া চড়া রোদে রঙ কালো হবার ভয় থাকে না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। যূথিকা এসে গেছে। কেউ কোথাও নেই। বহু দূরে নৃপেনবাবু টেবিলে জোড়া

হাঁটু ঠেকিয়ে উট হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। একটা পিওন খালি এসেছে। পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে একমনে সারা মাসের ঘুষের হিসাবে ব্যস্ত। আড়চোখে যূথিকাকে একবার দেখে নিলুম। বেশি দেখব না। কালকের ঘটনায় আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে। কথা বললে বন্ধ করে দিতুম। বলি না বলে বেঁচে গেল।

যূথিকা নিচু হয়ে টেবিলের নিচের ড্রয়ারটা ধরে টানাটানি করেছে। সরকারি টেবিল। মাঝে মাঝেই ড্রয়ার আটকে যায়। আমাদেরও আটকায়। লাথালাথি করলে তবে খোলে। খেলোয়াড় না হলে যেমন প্রেম হয় না, সরকারি চাকুরিও করা যায় না। সবে একমাস চাকরি হয়েছে মহিলার এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি।

হঠাৎ মনে হল, এই সুযোগ। নাউ অর নেভার। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

'কি, খুলছে না? আটকে গেছে?'

উঃ! যূথিকা ওই নিচু অবস্থাতেই ঘাড় বেঁকিয়ে খোঁপা লতপতিয়ে আমার দিকে তাকাল। কি মনোরম, কি অপূর্ব, কি অসাধারণ।

'দেখুন না খুলছে না। চাবি ঘুরে যাচ্ছে অথচ…'

'একেই বলে কলের গ্যাঁড়াকল।' বাঃ বেশ বলেছি। স্ট্রেট বলেছি, একটুও কাটায়নি।

'দেখি, সরুন। এসব লোয়েস্ট কোটেশানের মাল। খোলার কায়দা আছে।'

যূথিকা সোজা হল। এতক্ষণ হেঁট হয়েছিল। আহা মুখটা বেগুন হয়ে গেছে। আমি উবু হয়ে চেয়ারের পাশে বসে পড়লুম। ধুতি পরার এই সুবিধে। আমার মুন্ডুর একেবারে পাশেই যূথিকার জোড়া কল। সেন্টের কি প্রসাধনের গুমোট গন্ধ। ফ্লোরে শাড়ির ঘের ছড়িয়ে আছে। ভেবেছিলুম আমাকে বসতে দেখে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধুর মত একটা ভাব করে সরে বসবে। না সেসব কিছুই করল না। একেবারে সহজ। যেমন ছিল তেমনিই বসে রইল জমাটি হয়ে। উঃ সোমনাথ, মার দিয়া কেল্লা। যূথিকার একটা হাত তখনও চাবির ওপর।

'কই দেখি?'

গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা মনে হল। হাতে হাত ঠেকল। যেন শক খেলুম। ঠিকই, মেয়েদের শরীরে বিদ্যুৎ আছে। ঠেকলেই ঝটাস করে মেরে দেয়। প্রথম প্রথম ডি সি। তারপর কনভার্টারে পড়ে এ সি। আঁকড়ে মাকড়ে ধরে।

চাবিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। বাঃ বেশ কল তো। জয় মা, দেখো মা, খুলে দাও মা। প্রেম একবারই জীবনে আসে। বেইজ্জত করে দিও না। খুলতে পারলেই হিরো। ডানদিকে ঘোরাচ্ছি আর কায়দা করে টানছি। আমার ড্রয়ারটারও এই একই অবস্থা, ওয়ান, টু থ্রি। কি গুরু বল! খুস করে খুলে গেছে।

'এই নিন।' আমার সারা মুখে বিজয়ীর হাসি। দাও শ্যামা সুন্দরী গলায় বরমাল্য পরিয়ে দাও। এত বড় একটা দুরূহ কাজ করে দিলাম। হরধনু ভঙ্গের মত ব্যাপার।

'খুলেছে?' যূথিকা ঝুঁকে পড়ল। ডান গালটা আমার মুখের কাছে। ধন্যবাদ টন্যবাদ দেবার কোনও ইচ্ছেই নেই। কাগজ, কার্বন বের করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জাত টাইপিস্ট। কোথায় প্রেম? উঠে দাঁড়ালুম। পা ব্যথা হয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মনে কোন রেখাপাত করল না। কি মন রে বাবা! মা কালীর মত পাষাণী। এদিকে বকুল এসে গেছে। আমাকে যূথিকার চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমার কৃতিত্বটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'বুঝলেন, আটকে গিয়েছিল। ঘোরে কিন্তু খোলে না।'

বকুল হাতব্যাগ রাখতে রাখতে বললে, 'কি আটকে ছিল?'

আমাকে উত্তর দিতে হল না, যূথিকা টাইপ মেশিনে কাগজ আর কার্বন পরাতে পরাতে বললে, 'ড্রয়ারের চাবি।'

বকুল বললে, 'মুখপোড়া ড্রয়ার, ভেঙে ফেলে দে না!'

আমি হেলে দুলে ধীরে সুস্থে বেশ খেলে খেলে নিজের সিটে গিয়ে বসলুম। চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাববার মত ব্যাপার। এর পর কি! সোমনাথ আসুক। বেলা বারোটার আগে আসবে না। ততক্ষণ একটু কাজের অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি একটা প্রমোশন চাই। বলা যায় না, যদি ফেঁসে যাই, বিয়ে করতে হবে।

বিয়ে করলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তখন এ মাইনেতে সংসার চলবে না।

সোমনাথ এসে গেল। বসতে না বসতেই শুরু করে দিলুম। সিগারেট খেতে খেতে মন দিয়ে শুনল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এইবার? হোয়াট নেক্সট। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বললে, 'কত আছে?'

'কি কত আছে?'

'হার্ড ক্যাশ?'

সে আবার কি! হার্ড ক্যাশ দিয়ে কি হবে? দু-দশ টাকা পড়ে আছে। মাস শেষ হতে চলেছে!

'গোটা পনের টাকা পড়ে আছে। কোন রকমে মাসটা চলবে।'

'ওতে হবে না রে! তোর একটা প্রেমফাণ্ড তৈরি করতে হবে। মিনিমাম পাঁচশ টাকা নিয়ে নামতে হবে।'

'পাঁচশো! অত টাকা পাব কোথা থেকে?'

'কো-অপারেটিভ থেকে লোন নে, আমি গ্যারান্টার দাঁড়াচ্ছি।'

'ধার করে প্রেম!'

'শাস্ত্রেই আছে ঋণ করে ঘি। প্রথমে পাঁচশো তারপর কেস বেশ জমে গেলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে! তোর পাড়ায় লাইব্রেরী আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'মেমবার?'

'এক সময় ছিলুম। চাঁদা বাকি পড়ায় ছেড়ে দিয়েছি, একটা বই মেরে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। আজই আবার মেমবার হয়ে যা।'

'লাইব্রেরীর মেমবার হবার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক? লেখা পড়া করতে হবে না কি!'

'আজ্ঞে না। অফিসের মেয়েরা বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। কালকে তুই······'

'কালকে তুই কি করবি!'

'তুই একটা বই হাতে, মলাটের দিকটা সামনে করে যূথিকার

সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবি, হেসে হেসে জিজ্ঞেস করবি—কি ড্রয়ার আটকে গেছে নাকি।'

'তারপর ?'

'তারপর বইটা হল টোপ। কি বই দেখি? ব্যস বইটা দিবি পড়তে। দিবি আর নিবি, দিবি আর নিবি। দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে।'

'ভীষণ ভয় পাই রে! ছাত্র জীবনে এক পড়ুয়া মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলুম। বইয়ের পর বই দিয়েই যাই, ফেরত আর পাই না। সাহস করে চাইতেও পারি না। বই পেয়ে খুশি খুশি ভাব। মেয়েদের খুশি করে ছেলেরা কিরকম আনন্দ পায় ভাব! বই ফেরত চাইলে যদি রেগে যায়।' সেই ভয়ে মাইরি দিয়েই যাই। আমি দিতে থাকি সে নিতে থাকে। হাতে তেমনি পয়সাও নেই। জলখাবারের জন্য রোজ এক আনা বরাদ্দ। তিরিশ দিনে তিরিশ আনা। পাঁচটা রোববারে পাঁচ আনা বাদ। তার মানে পঁচিশ আনা। এদিকে যাদের যাদের কাছ থেকে বই এনে পড়তে দিয়েছি তারা বই চেয়ে না পেয়ে খেপে বোম। একদিন সবাই মিলে রাস্তায় চেপে ধরে বেধড়ক ধোলাই দিলে। তিনমাস জলখাবার বন্ধ রেখে যার যার বই কিনে ফেরত দিলুম। আর আমার কুমকুম!

'কুমকুমটা কে ?'

'আরে সেই বই-মারা মেয়েটা। কি জিনিস মাইরি। পরে জেনেছিলুম ওই মেয়েটা আমাদের মত এক একটা বোকা ছেলে ধরে ধরে বই মেরে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরী তৈরি করছিল। একটু মিষ্টি হাসি, সুর করে টেনে টেনে কথা উয়ুঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর, ব্যস, আমরা কাত। গিলোটিনে মাথা পেতে বে হেড।'

সোমনাথ ফুস্ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল ঃ

'তোর প্রেম নেই। তোর দ্বারা প্রেম হবে না। শালা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেনেদের মত মেণ্টালিটি। প্রেমিক আর যোগী একই মনের মানুষ। একজন মেয়ে-পাগল আর একজন ব্রহ্ম-পাগল। পাগল না হলে প্রেম হয় না। শ্যান পাগল বুচীক আগল হারা, তাদের জন্যে সংসার, হিসেবের খাতা, বগলে ছাতা, মুতো খাতা।'

'তুই বুঝছিস না, আমার এখন একস্ট্রা খরচ করবার মত টাকা নেই ভাই। একটা বইয়ের দাম আট টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা। মেরে দিলেই হাতে হ্যারিকেন।'

'তবে হাঁ করে বসে থাক। ওদিকে বিধান ভিড়ে পড়ুক।'

সোমনাথ আর কথা না বাড়িয়ে একটা পুরোন বস্তা পচা ফাইল খুলে বসল। ওরকম ফাইল আমার টেবিলেও গোটা কতক আছে। একটা খুললেই সারাদিন হেসেখেলে চলে যাবে। বাইরের আকাশে চাঁপা ফুলের মত রোদ খেলে যাচ্ছে। ফুরফুরে বাতাস। এমন দিনে কি মানুষের দুঃখ কষ্টের ফাইল খুলে বসে থাকা যায়। রাজ্যের আরজি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ চিত্র দুটো বাদামী মলাটের তলায় যতদিন চাপা থাকে ততদিনই ভাল। কল্পনায় যূথিকাকে নিয়ে বোটানিকসে ঘুরে বেড়াই।

সোমনাথ চিঠি ড্র্যাফট করছে। আজ দেখছি কাজে খুব আঠা! দেশের উন্নতি না করে ছাড়বে না। ওদিকে প্রসূন গিয়ে যূথিকার টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। মূলোর মত দাঁত বের করে খুব হাসছে। যূথিকাও হাসছে। কোনও মানে হয়। প্রসূন আবার ভাল রবীন্দ্র সংগীত করে। চাকরিতে যেমন প্রতিযোগিতা, প্রেমেও তেমনি। কোন মেয়ের সঙ্গে একা প্রেম করার উপায় নেই। ফোড়ে, ফেউ জুটবেই। কেকের টুকরো। ডিশে রাখলেই পিল পিল পিঁপড়ে। এখুনি এক কলি গান গেয়ে কেল্লা দখল করে নেবে। দাঁত বড়, গাল ভাঙা, চোখ বসা, এসবের কোনটাই যূথিকার চোখে পড়বে না। গান গাইতে পারে, ব্যস, সাতখুন মাপ। আমি নাচ দেখাব। ভাঙড়া নাচ। ধুত, প্রসূনটা আচ্ছা হারামজাদা! কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

'সোমনাথ!'

'বল।'

'গান শিখবি?'

'গান শিখে কি করব?'

'ওই দেখ, প্রসূন ব্যাটা পাকাধানে মই দিতে গেছে।'

যাক না, তাতে তোর কি? ভ্যাকুয়ামে প্রেম করবি ভেবেছিস? ফেউ, এর পর ফেউ আসবে। লড়ে জিততে হবে। রোপ ওয়াক।

গেল গেল, এল এল। কোন দিন ঘুড়ি উড়িয়েছিস? তুমি ত শালা জীবনে কিছুই করনি। শুধু জন্মে বসে আছে, প্রেম হল ঘুড়ির প্যাঁচ। কাটতে থাক, কাটতে থাক, একসময় ফাঁকা নীল আকাশ, প্রাণ খুলে ওড়া। নীল আকাশের সঙ্গে প্রেম।'

সোমনাথ আবার খসখস করে চিঠি লিখতে শুরু করল। আমি টেবিল থেকে উঠে পড়লুম। ওদের পাশ দিয়ে একবার চলে যাই। নুনপ্লেয়িং ক্যাপটেন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা ভেবেছি তাই। প্রেমে পড়লে সিকসথ সেনস বেড়ে যায়। প্রসন্ন বলছে, 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে রেকর্ডটা আমার আছে। কালই এনে দেবো। ঢং করে একটা সিকি পায়ের কাছে পড়ল। উঃ কি লাক্! যূথিকার পয়সা 'ব্যাগ থেকে ছিটকে এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলে দুবার ফুঁ মেরে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গেলুম।'

'আপনার পয়সা।'

প্রসন্ন হাত বাড়িয়ে সিকিটা নিয়ে পকেটে ফেলে গম্ভীর মুখে বললে,

'ধন্যবাদ। হাঁ হাঁ, আকাশ ভরা সূর্য তারাটাও আছে। কি নেই আমার কাছে।'

যাঃ শালা। কি বরাত। প্রসন্নের পয়সা জানলে কে তুলত! পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতুম। প্রেম তুমি আমাকে উদার কর। বেশ জমিয়ে প্রেমে পড়ার আগেই কেন হিংসে এসে যাচ্ছে! কেন মনে হচ্ছে প্রেম বড় একতরফা। প্রেমে গলি কি ওয়ান ওয়ে? হৃদয়ের গাড়ি ঢোকে। ঢুকে আটকে যায়। বেরোতে গেলে ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে হয়। আপাতত ব্যাক করে নিজের জায়গায় চলে যাই। মাথায় কিছু আসছে না। সোমনাথই ভরসা।

মুখ খোলার আগেই সোমনাথ বুঝে গেছে।

প্রসন্ন লাইন দিয়েছে। দেখেছি। তোর চেয়ে ভাল ক্যানডিডেট। শীতকালে কাশ্মীরী শাল গায়ে দেয়। পাঞ্জাবিটা দেখেছিস, চিকনের কাজ করা। ভাল গান গায়। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বেশ শক্তিশালী। বেশ কায়দা করে লড়তে হবে রে। মেয়েছেলের মন পদ্মপাতায় জল। যাক, তোর আর একটা সুযোগ করে দি। এই চিঠিটা টাইপ করতে দিয়ে আয়। বলবি ডবল

স্পেসিং, দুপাশে মার্জিন। আর ফট করে জিজ্ঞেস করবি বিকেলে কি করছেন ?'

'যদি বলে কেন ? কেনটা আবার যদি খুব চিৎকার করে বলে। পাশে যারা বসে আছে তারা যদি শুনতে পায় !'

'আ মোলো।' সোমনাথ মেয়েলী ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠল ! 'রাশকেল যদি যদি করেই তোর জীবনটা যাবে। যদি ফদি আবার কি ! জীবন হল, ধর তক্তা মার পেরেক।'

'যদি বলে কেন।'

'আবার শালার যদি। বলবি সোমনাথ কোরবানীর টিকিট কেটেছে।'

'একেবারেই জাম্প করে অতদূর !

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেই বলে বলিষ্ঠ অ্যাপ্রোচ। সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। যা যা।' যূথিকাকে চিঠিটা টাইপ করার জন্যে দিতেই, সোমনাথের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সোমনাথ ইশারায় হাতের ভঙ্গি মুখের হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল টাইপ। যূথিকা চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'কি সাংঘাতিক হাতের লেখা !'

আমি অমনি ফট করে বলে ফেললুম, 'আমার হাতের লেখা খুব ভাল। মুক্তোর মত।' বলে ফেলতেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলুম। প্রেম মানুষকে জাহির করতে শেখায়। অহমটাকে খুঁচিয়ে তোলে। ভেরি ব্যাড।

যূথিকা বললো 'দেখেছি। শিল্পী শিল্পী চেহারা, শিল্পী শিল্পী কথা, মানানসই লেখা।'

যূথিকার কথা শুনে পা কাঁপছে। উরে বাব্বা, প্রেমের ঘণ্টা বেজেছে ঢং করে। মুখে কথা সরছে না। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে ফিরে এলুম।

সোমনাথ বললে, 'কি হল ? জিজ্ঞেস করেছিস ? কি বললে ? বিকেলে কি করছে ?'

'দাঁড়া এক গেলাস জল খাই।'

'কেন ? খিস্তি করেছে ?'

জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে, হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে ফিস ফিস করে বললুম,

'মরে গেছি, ফিনিশ। বুকটা কেমন করছে।'
'পেটে উইণ্ড হয়েছে। একটা পান খা।'
'ভাগ শালা। বুকে হিল্লোল বইছে, হিল্লোল।'
'কেন রে। চোখ মেরেছে!'
'মোর দ্যান দ্যাট। তীর মেরেছে। তোর হাতের লেখার নিন্দে করে আমায় বললে, যেমন আপনার শিল্পী শিল্পী চেহারা ঠিক সেই রকম আপনার কথাবার্তা, ঠিক সেই রকম আপনার মুক্তোর মত হাতের লেখা।'
'এইতেই তোর বুক ধড়ফড়। ওর গদিতে তোকে দিয়ে খাতা লেখাবে না কি! তোর গালে হাত দিলে কি করবি? দম ফেল করে মরে যাবি। শোন, কোনটা মেয়েদের কথা আর কোনটা কথার কথা, আগে বুঝতে শেখ। যা জিজ্ঞেস করে আয়।'
এবার আমার সাহস বেড়ে গেছে। বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন আর ভয় কি। নদী বইবে কুলু কুলু। পাখি গাইবে গান, পিউ কাঁহা। গড়গড়িয়ে চলে গেলুম।
'আজ বিকেলে কি করছেন?'
'ক্লাস আছে।'
'কিসের?'
'স্টেনোগ্রাফির।'
'ও।'
সোমনাথের কাছে ফিরে এলুম, 'ওরে স্টেনোগ্রাফির ক্লাস আছে।'
'বলে আয় ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা।'
আবার যেতে হল, 'ক্লাস-ফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা। কোরবানী।'
'কোরবানী।' যেন লাফিয়ে উঠল। 'কে বললে?'
'গ্রেট সোমনাথ।'
'ঠিক আছে।'
সোমনাথকে এসে বললুম, 'ঠিক আছে।'
সোমনাথ বললে, 'সিনেমার কথায় যে মেয়ে না বলবে, জানবি সে অসুস্থ। স্ত্রী-রোগে ভুগছে।'

সারাটা দুপুর পেটটা কেমন কেমন করতে লাগল। নার্ভাস ডায়েরিয়া। বেয়ারাকে দিয়ে দুটো ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নিলুম। বলা যায় না, হলে বসে প্রকৃতির বেগ এসে গেলে লজ্জার একশেষ হবে। একেই মেয়েরা গ্লাডিয়েটার কিম্বা বুল ফাইটার কিম্বা কাউবয়দেরই ভালবাসে। আমার আবার একটু মেয়েলী মেয়েলী ভাব। হরমোন খেয়ে পুরুষ পুরুষ হতে হবে।

দেখতে দেখতে বিকেল। সোমনাথের দু প্যাকেট সিগারেট উড়ে গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। আমরা তিন জনে লিফটে করে নিচে নেমে এলুম। রাস্তায় সোমনাথ হাঁটছে আগে আগে। লিডার অফ দি টিম। পেছনে আমি। আমার এক কদম পেছনে যূথিকা। সোমনাথ আমাকে প্রেম করাতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই বলে বন্ধুর মত বন্ধু। বন্ধু হো তো অ্যায়সা।

বাইরের আলোয় যূথিকাকে একটু বেশি শ্যামবর্ণ মনে হচ্ছে। হলেও খারাপ লাগছে না। হাতে ফোলডিং লেডিজ ছাতাটা না থাকলেই ভাল হত। ছাতা হাতে তেমন রোম্যানটিক লাগে না। যাকগে, যা করে ফেলেছে। সিনেমায় যাব বলে তো আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। বেরিয়েছিল অফিসে।

সোমনাথ ভস ভস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আগে আগে গটগট করে চলেছে। স্টিম ইঞ্জিন চলেছে। আমরা যেন দুটো বগি। পেছন পেছন চলেছি লাফাতে লাফাতে। ইঞ্জিন যে দিকে যাবে, বগিও সেই দিকে যাবে। ইঞ্জিন হেলেদুলে একটা নামজাদা রেস্তোরাঁর অন্ধকার গর্ভে গিয়ে ঢুকল। বেশ মনোরম পরিবেশ। প্রেমের সুখপাখি এমন জায়গাতেই মাথা মুড়ে বসতে পারে। ফিসফাস, খুসখাস, ঘেঁষাঘেঁষি। দুল, চুড়ি, গোঁফ, দাড়ি, ঘাড়, গলা, চিবুক সব একাকার।

সোমনাথ তো খুব গ্যাটগেটিয়ে মেয়ে বগলে ঢুকল। মেয়ে ঢুকল ছাতা বগলে। আমি ঢুকলুম কোঁচা বগলে। কিন্তু! কিন্তু আর যদিতেই আমার জীবনটা শোঁয়াপোকার মত কুকড়েই রয়ে গেল। প্রজাপতি আর হল না। কত বিল হবে কে জানে। টাকা কে দেবে! আমার পকেটে পনের টাকা পড়ে আছে।

সোমনাথের বাঁ পাশে যূথিকা। আমি বসেছি উল্টো দিকে

একা। সোমনাথ মেজর জেনারেলের মত হাঁকল 'ওয়েটার'। বাব্বা কি দাপট। 'মেনু প্লিজ'। মেনুটা হাতে নিতে নিতে সোমনাথ বললে, 'জিরাপানি।' সেটা আবার কি রে বাবা। মেনুর ওপর আবছা চোখ বুলিয়ে পরের অর্ডার 'রোগনজুস। নাস। স্যালাড। আইসক্রীম ভ্যানিলা। মেনুটা ওয়েটারের দিকে ঠেলে দিল। হাত নিসপিস করে উঠল। একবার টেনে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, ক'টাকার ধাক্কা। দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না। নেভি ব্লু স্যুট পরা ময়ূর ছাড়া কার্তিকের মত ওয়েটার টুক করে তুলে নিয়ে আলোছায়া ঘেরা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'তারপর ম্যাডাম!' সোমনাথ সব মেয়ের সঙ্গেই ম্যাডাম দিয়ে শুরু করে। এইটাই হল ওর টেকনিক। বিরাট পার্সোন্যালিটি মেগালোম্যানিয়াক। ম্যাডাম বলে যূথিকাকে দেয়ালঠাসা করে বসল। ম্যাডাম টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুলে কিলিবিলি খেলছেন। নাকছাবি, দুল, চশমা, আলো পড়ে চিক চিক করছে। স্বপ্ন স্বপ্ন।

সোমনাথ হঠাৎ ছাতাটা যূথিকার কোল থেকে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'ফরেন?'

'হ্যাঁ ফরেন। আমার এক পিসতুতো দাদা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছে।'

সোমনাথ ছাতাটা আবার যূথিকার কোলে খচর মচর করে গুঁজে দিল। মেয়েটা সোমনাথের হাতের স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠল। উঃ ভাবা যায় না। সোমনাথের কি সাহস রে বাবা। মেয়েরা বোধ হয় এই রকম হাতকেই বলে আগ্রেসিভ হ্যাণ্ড। আমি একটা ভ্যাবাচ্যাকা জরদ্গবের মত উল্টো দিকে বসে আছি। প্রেম ফ্রেম মাথায় উঠে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি প্রেমের মাঠে আমি এক নাবালক।

ঢক ঢক করে তিন গেলাস জিরাপানি ওয়েটার আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল। সোমনাথ বললে, 'নে খেতে থাকা অ্যাপেটাইজার।'

পৃথিবীতে কত রকমের যে খাদ্য আছে, পানীয় আছে। এই পঁচিশটা বছর ধরে শুধু ভাত ডাল আর ডাল ভাত খেতে খেতেই

জীবনে অরুচি ধরে গিয়েছিল। জিরাপানিতে চুমুক মেরে পঁচিশ বছরের বোদা মুখ ছেড়ে গেল। বিশেষ একটা সময়ে মেয়েদের স্বাদ না সাধ কি একটা হয় না। মনে হল আজ আমার তাই হচ্ছে।'

খাবার এসে গেল। সে এক এলাহি ব্যাপার! ব্যাঙের মত ফুলো ফুলো নান না কি যেন ওই। মাঝখানে ঘি, কালো জিরে। রোগনজুস। স্যালাড। সোমনাথ গপাগপ খেতে শুরু করল। যূথিকাও কম যায় না। আমি মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছি। মনে হচ্ছে আমার সামনে বসে আছে জামাইবাবু আর দিদি। আমি যেন ছোট্ট শ্যালকটি। দুজনে বেশ জমে গেছে। কথা চলছে, হাসি চলছে। সোমনাথ মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চামচে দিয়ে যূথিকার প্লেটে স্যালাড তুলে দিচ্ছে। কোলের ওপর ন্যাপকিন পেতে দিচ্ছে। সোমনাথের কাণ্ড দেখে আমার মুখ শুকিয়ে আসছে। হয়ে গেল আমার প্রেম। নদী এখন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে।

আইসক্রীম এসে গেল। মাঝখানে আবার কায়দা করে পাতলা পিচবোর্ড গোঁজা। সোমনাথ বললে 'পিচবোর্ড নয় রে, ওটা বিস্কুট। ওকে বলে ওয়াফার।' যূথিকা আদুরে গলায় বললে, 'আইসক্রীম খাব না। গলা ধরে যাবে।'

সোমনাথ বললে 'কিছু হবে না ম্যাডাম। ঠাণ্ডা ঘরে বসে আইসক্রীম খেলে গলায় ঠাণ্ডা লাগে না।'

সোমনাথের কথা যেন বেদবাক্য। যূথিকা হেসে হেসে খেলে খেলে আইসক্রীম খেতে লাগল। হাত ধোয়ার গরম জল এল বাটিতে। এক টুকরো লেবু ভাসছে। আমি ভেবেছিলুম গুরুপাক খাওয়া হল তো, তাই জিরাপানির মত লেবুপানি এসেছে। সোমনাথ বললে 'মুখ', একে বলে ফিঙ্গার বোল। লেবুটা হাতে চটকে দে। ইট কাটস দি গ্রিজ।' পেছনের দিকে মুণ্ডু ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বেয়ারা, বিল।'

কি আদেশের সুর! এ সব ছেলে পৃথিবী শাসন করতে পারে, যূথিকা তো সামান্য মহিলা। বিল এল। আমার জিভেতে তালুতে আটকে গেছে। আমাকে দিতে হলে ঘড়ি খুলে দিতে হবে। না সোমনাথই পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করল। ঠোঁটে সিগারেট বাঁকা। নাক ছুঁয়ে ধোঁয়া উঠছে চোখের সামনে দিয়ে।

নাকের কাছটা কোঁচকান। চোখ দুটো হয়ে আছে গ্রেট গ্যাম্বলারের তাসের চাল দেবার মত। বিল সমেত পঞ্চাশ টাকার একটা নোট প্লেটের ওপর ফেলে দিল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় যূথিকার পিঠে তবলায় তেহাই মাবার মত করে আঙুলের তিনটে চাপড় মেরে বললে 'চল, চল।'

বাঃ ভাই। কত কায়দাই জান? আমার প্রেমিকার পিঠে তবলা বাজানো। আমার আর কি রইল। যূথিকা যে ভাবে তোমার বক্ষলগ্না, তৃতীয় চোখে দেখলে মনে হবে পারফেক্ট স্বামী স্ত্রী।

রেস্তোরাঁর উল্টো দিকেই পান সিগারেটের দোকান। বরফের চাঙড়ার ওপর হলদে হলদে পান পাতা শোযানো। বিশাল দোকান। বিশাল আয়না। বোতলের জল। জর্দার গন্ধ। ধূপ জ্বলছে। সোমনাথ বললে, 'তিনটে মঘাই পান। একটায় কিলপাতি জর্দা। আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়।'

'আমি পান খাই না।'

'তাহলে দুটো নিয়ে আয়।'

বুঝলাম এটা আমার ইনভেস্টমেন্ট। সাড়ে তিন টাকা খসে গেল। যূথিকা পান চিবোচ্ছে আর ঠোঁট উলটে উলটে দেখছে কি রকম লাল হল।

সোমনাথ আমাকে ফুটপাতের একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে, 'শোন আমার কাছে দুটো টিকিট আছে। ব্যাপারটা তোর জন্যে প্রায় সড়গড় করে এনেছি, বাকিটা সিনেমা হলে গিয়ে করব। একটু ঈজি না করে দিলে তুই সামলাতে পারবি না। আমরা চলি, কাল তোকে সব বলব। হয়ে এসেছে। যেটুকু বাকি আছে হলে হয়ে যাবে।'

সোমনাথ ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে। পেছনে এবার একটা বগি। আর একটা বডি সাইডিং এ পড়ে রইল। সেই বগির ভেতরে কে একজন হই হই করে হেসে উঠল, মূর্খ, মূর্খ। প্রেম বলে কিছু নেই। আছে লটকালটকি, আছে শান্টিং।

ছুটি

বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু ধুঁকতে ধুঁকতে বিরাট অফিসবাড়ির লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চুল পেকে পাটের মত চেহারা হয়েছে। চারপাশে ঝুলে আছে এলোমেলো, বহু ব্যবহৃত ঝুলঝাড়ুর মত। চুলের আর অপরাধ কি? সারা জীবন মাথার ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপটা গেছে! জীবনটাকে দাঁড়িপাল্লায় ফেললে, সুখের দিকে পড়বে ছটাকখানেক, বাকিটা দুঃখ। যখন যেখানে পা ফেলেছেন, সবই পড়েছে বেতালে। একেই বলে মানুষের ভাগ্য। সেই কথায় বলে না, বরাতে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?

বগলে রঙচটা ছাতা। হাতে একটা মার্কিনের ব্যাগ। ব্যাগে কিছু দরকারি কাগজপত্র, আর একটা চশমার খাপ। খাপে ময়লা একটা দু টাকার নোট, পথ-খরচ। আর ছোট্ট একটা ঠোঙায় গুটি-কয় বাতাসা। রক্তে চিনি কমে গেছে। ডাক্তারের নির্দেশ, মাথা ঘুরলেই একটু চিনি খাবেন। চিনির যা দাম! ওই পথ চলতে চলতে মাঝে মধ্যে একটা দুটো বাতাসা ফেলে দেন মুখে।

লিফটের সামনে তেমন ভিড় নেই। অফিস অনেক আগেই বসে গেছে। লেটের বাবুরাও সব এসে গেছেন মনে হয়। আজকাল অফিস একটু কড়া হয়েছে। কাগজে পড়েছেন। সত্যি মিথ্যে জানেন না। লিফটের সামনে গন্ধটন্ধ মাখা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘর্মাক্ত, রোদে পোড়া, সচল ঝুলঝাড়ু সদৃশ প্রসন্নবাবুকে দেখে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। প্রসন্নবাবু মনে মনে হাসলেন।

মা জননী, জীবনের বসন্ত বড় ক্ষণস্থায়ী। হেসে নাও হেসে নাও, দুদিনই বই তো নয়! ওই চুল পাকবে, গোলাপী গাল কোল্ড স্টোরে রাখা আপেলের মত ধেসকে যাবে। সরু কোমরটি হবে হাতির গোদা পায়ের মত।

ওপর থেকে লিফট নেমে এল নিচে, লাল আলোর অক্ষর কমাতে কমাতে। জীবনটা যদি লিফটের মত হত! উলটো হাতল ঘুরিয়ে বয়েসটাকে কমাতে কমাতে শূন্যে নিয়ে আসতেন। আবার মাতৃ-জঠরে, আবার ভূমিষ্ঠ। অন্নপ্রাশন। তারপর বেশ হিসেব করে দুধে ছেলের মত বড় হওয়া, ফার্স্ট ফ্লোর, টপ ফ্লোর। একেবারে টঙে উঠে, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতেন। সব ক্ষুদি ক্ষুদি মানুষ, পৃথিবীর পিঠে যেন পোকা ঘুরছে।

সাত নম্বর তলায় লিফট থেকে নেমে পড়লেন তিনি। সেই পুরনো কর্মস্থল। সব এখন পালটে গেছে। বেশির ভাগই নতুন মুখ। কেউ তাঁকে চেনে না। যারা চেনে, তারাও যেন না চেনার ভান করে। একজন মানুষ রিটায়ার করে চলে গেলে, তাকে আর মনে রেখে লাভ কি! তার কাছ থেকে কি আর পাওয়া যাবে, দুঃখের কাঁদুনি ছাড়া। উলটে বরং যাবে। এক কাপ চা ভদ্রতা করে খাওয়াতে হলে, এ বাজারে তিরিশটা পয়সা। ওর সঙ্গে কুড়িটা পয়সা জুড়লে এক পিঠের বাসভাড়া।

লম্বা হলঘরে সে পরিচিত অফিস এখন কত অপরিচিত। ঘিঞ্জি, নোংরা। কোনও যেন ছিরিছাঁদ নেই। ক্যাডাভ্যারাস। যে যেখানে পেরেছে, একটা করে টেবিল চেয়ার পেতে বসে পড়েছে। কিছু টেবিল নতুন। কিছু সেই বৃটিশ আমলের। আকার, আকৃতি দেখলেই ডায়ার কিম্বা টেগার্টের কথা মনে পড়ে। যে অফিস দেখে এখন ঘৃণায় নাক সিঁটকোচ্ছেন, সেই অফিসেই সারাটা জীবন ফাইল নেড়ে অক্লেশে কাটিয়ে গেছেন। প্রথম দিকে এ অফিসও ছিল না। যুদ্ধের পর একটা ভাঙা টিনের চালার-তলায় অফিস বসত। গ্রীষ্মে জীবন বেরিয়ে যেত। মাথার ওপর হাণ্ডা পাখা ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দে গরম বাতাসের ন্যাজ নাড়ত। ছাতাধরা কুঁজোয় জল। নোংরা টুলের ওপর একপাশে কেতরে থাকত। মুখে একটা পিচবোর্ডের ঠুলি। সারাদিন কাজ

করো, আর ঢোঁকের ঢোঁক জল খাও। সে সময় অফিসে তবু কাজ হত। ডাক্তার রায়ের আমল। নিজে স্বপ্ন দেখতেন, অন্যকেও সেই স্বপ্ন দেখাতে জানতেন। বড় বড় পদে বেশ কিছু স্বদেশী করা মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল। কাজে গাফিলতি হলে জবাবদিহি করতে হত। সাসপেনসান কিংবা ট্রানসফারের ভয় ছিল। কাগজে কোনও দপ্তরের সামান্যতম সমালোচনা হলে ফাটাফাটি হয়ে যেত। তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যেত। তখন অফিসে অফিসে এত সুন্দরী মহিলা ছিল না। টেবিলে টেবিলে প্রেমালাপ ছিল না। প্রজাপতি উড়ত না ফুরফুর করে। ঘুসঘাস ছিল না, থাকলেও খুব সামান্য, খুব লুকিয়ে চুরিয়ে, জায়গা বিশেষে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে সব যেন কেমন হয়ে গেল? স্বাধীনতা যত পুরনো হতে লাগল দেশটা যেন পচে ফুলে উঠল। চিকিৎসার বাইরে চলে গেল সব। নতুন বাড়িতে অফিস এল। কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ল জোয়ারের জলের মত। অসংখ্য কেতাদুরস্ত অফিসার। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। ফাইলই বাড়ল। দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে প্রসন্নবাবু দূর কোণের দিকে তাকালেন। তিনি যে চেয়ারে, যে জায়গায় শেষ বসে গেছেন সেখানে একজন হৃষ্টপুষ্ট মহিলা এসেছেন। খেঁকুরে প্রসন্নর জায়গায় ভরভরন্ত রমণী। কাঁধকাটা ব্লাউজ বেয়ে পাইথনের মত হাত নেমেছে। যাকে যখন ধরবেন তার আর নিষ্কৃতি নেই। মুখটি যেন তিল ফুলের, নীল শাড়ি, ফর্সা রঙ, কোণটা যেন আলো হয়ে আছে। বয়েস হয়েছে, চোখে চালসে, শরীর ঢকঢকে, দুপা হাঁটলে হাঁপ ধরে, তবু মেয়েছেলে দেখার চোখ সরে না। মানুষ একটা জীব বটে! যত দুর্ভোগ বাড়ে, তত ভোগের আকাঙ্ক্ষাও বাড়ে। বাবু প্রসন্ন, স্থির হও।

প্রসন্নবাবু নিজেকে উপদেশ দিয়ে, সরাসরি টেবিলের মাঝখান দিয়ে অশোক বসুর আসনের দিকে এগোতে লাগলেন। অশোক বসুই এখন একমাত্র ভরসা। রিটায়ার করেছেন প্রায় তিন বছর হল, এখনও পেনসান পেপার তৈরি হল না, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ফেরত পেলেন না। আর কয়েক মাস পরেই মেজ মেয়ের বিয়ে।

কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। দর কষাকষি চলছে। রফা একটা হবেই। মেয়ে যখন, আইবুড়ো তো আর ফেলে রাখতে পারেন না। জীব-ধর্ম বলে কথা!

প্রসন্নবাবু অশোক বসুর টেবিলের সামনে এসে মৃদু গলায় ভয়ে ভয়ে ডাকলেন, 'বাবা, অশোক'। বয়েসে অনেক ছোট। ছেলের বয়সী। বাবা ছাড়া আর কি বলবেন! বড়ো স্নেহের ডাক। বয়ঃকনিষ্ঠদের আজকাল তিনি এইভাবেই ডাকেন। এর মধ্যে তেমন কোনও স্বার্থ নেই। যে বয়েসে এসে ঠেকেছেন সে বয়েসে স্বার্থের কথা আর তেমন করে ভাবা যায় না। এখন সব জিনিসই হলে হবে, না হলে না হবে। হিসেবের খাতার শেষ পাতায় দেনা-পাওনার অঙ্ক মেলাতে বসলে চোখ খুলে যায়। সারা জীবন পেতে হবে, পেতে হবে করে, কি পেয়েছেন! এ যেন আমবাগানে আম কুড়োতে গিয়ে কোঁচড় ভর্তি ইটের টুকরো নিয়ে ফেরা। সেই দেনেঅলা মালিক একজন। তিনি যাকে দেন তাকে ছপ্পর ভরে দেন। যাকে দেন না, তাকে কিছুই দেন না, এমনকি তার পাওনা টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনসান সব আটকে রেখে দেন। ঘুরে, ঘুরে, ঘুরে, ঘুরে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যায়। কত অসহায় প্রাণী এই সামান্য জাগতিক আকর্ষণে ভূত হয়ে, বড় বড় অফিসবাড়ির কার্নিশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে। সুযোগ পেলেই বড়বাবুর কানের কাছে, খোনা খোনা গলায়, বাতাসের সুরে বলে যায়, বঁড়বাঁবুঁ, আঁমাঁর পেঁনসাঁন, আঁমার ফ্ঁভিঁডেঁন্ট ফাঁন্ড। বড়বাবু ভাবেন, কি যেন একটা শুনলুম। কানের পাশে হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার মত, শব্দটাকে উড়িয়ে দেন, ও কিছু নয়, মনের ভুল। যারা মানুষ খুন করে, তারাও মাঝরাতে অনেক অশরীরী শব্দ শুনতে পায়, তুমি আমায় মারলে তুমি আমায় বিধবা করলে, শিশুর আর্তনাদ, নারীর আর্তনাদ, যুবকের মৃত্যুকালীন চিৎকার, কণ্ঠনালির উন্মুক্ত ভাগ দিয়ে বেরিয়ে আসা বাতাস আর রক্তের ঘড় ঘড় শব্দ। তারা গ্রাহ্য করে না। শোনার মত না শোনাতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। সাধনায় কি না হয়?

একটা শতচ্ছিন্ন, বোস-পুরনো ফাইল খুলে, অশোক বসু ধ্যানস্থ ছিলেন। হয়তো লর্ড ক্লাইভের আমলের কোনো কেস।

আজও যার ফয়সালা হয়নি। দু পক্ষে চিঠি-চাপাটি চলছে তো চলছেই। অনন্তকাল চলবে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ যুগের স্লোগানই হল, চলছে চলবে। অশোক বসু বিরক্তি-ভরা গম্ভীর মুখ তুলেই, প্রসন্নবাবুকে দেখে বিগলিত হাসিতে গলে একেবারে মাখনের মত হয়ে গেলেন। প্রসন্নবাবু বড়ো অবাক হলেন। এখানকার আকাশে তো কোনওদিন সূর্যোদয় দেখেননি? আজ হঠাৎ কি হল! উনি যা শুনবেন ভেবেছিলেন, তা হল, অ, আবার এসেছেন? আপনার তাগাদায় মশাই অফিসে তিষ্ঠনোই দায় হল! ক'বছর হল মশাই? মাত্র তিন বছরেই হেদিয়ে গেলেন! পেনসান পেপার তৈরির ঝামেলা জানেন? আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড! সে মশাই আমাদের হাতে নেই। আমরা পাঠিয়েছি। ভাগ্যে থাকলে আজও হতে পারে, আবার দশবছর পরেও হতে পারে। আপনি এখন মনে করুন গর্ভাবস্থা চলছে। সময় হলে ডেলিভারি হবে। টানা হ্যাঁচড়া করলে, তিন তরফেরই বিপদ। প্রসূতি মরবে, বাচ্চা মরবে, জেলে যাবে গাইনি।

অশোক বললেন বসুন বসুন। অঃ, বাইরে আজ ভীষণ রোদ। চোখ মুখ কালো হয়ে গেছে। আহা শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। এ দেশে বৃদ্ধরা বড়ো অবহেলিত। হালের বলদের মত। যতদিন শক্তি, ততদিন খাতির। যেই বসে গেল, টানতে টানতে নিয়ে যাও কষাইখানায়।

প্রসন্নবাবু সামনের চেয়ারে বসতে বসতে অবাক হয়ে পুত্রসম ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই শুষ্ক পৃথিবী কি আবার জলসিক্ত, স্নেহসিক্ত, করুণাসিক্ত, বড় নির্ভর একটি স্থান হয়ে উঠল নাকি! মানুষ মানুষের কথা ভাবছে! চোখে জল এসে গেল। সকালেই পরিবারের সঙ্গে এক পক্কড় হয়ে গেছে। টাকার জোর না থাকলে সংসার এক বিতিকিচ্ছিরি জায়গা। এ যেন মুদিখানার দোকান। স্নেহের কিলো একশো টাকা, মমতা দেড়শো টাকা, সেবা দুশো টাকা, ভালোবাসা পাঁচশো টাকা। দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে লেনা-দেনা। মানুষ তাই নিয়েই মেতে আছে। জুতো, ঝ্যাঁটা, লাথি খেয়েও মরার সময় হাতে পায়ে ধরাধরি, আরও কিছুকাল, আরও কিছুকাল।

অশোক বসু গলা চাড়িয়ে কাকে যেন বললেন, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাও!

প্রসন্নবাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ছেলেটা রাতারাতি অন্তর্যামী হয়ে গেল নাকি? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ঠিক টের পেয়েছে তো?

শুধু জল নয়। জলের পর চা এসে গেল। কাপের দিকে হাত বাড়াতে ইতস্তত করছিলেন। কে জানে বাবা, কার জন্যে চা এসেছে? আগে তো কখনও এমন হয়নি?

চায়ের কাপটা প্রসন্নবাবুর দিকে সামান্য একটু ঠেলে দিয়ে অশোক বসু বললেন, নিন, চা খান। চা খান। গ্রীষ্মের তেষ্টা জলে যাবার নয়। গরম চা না খেলে মিটবে না।

প্রসন্নবাবু কাঁপা কাঁপা হাতে ঠোঁটের কাছে কাপ তুললেন। পানসে চা। তবু চা তো। একচুমুক মেরেই থমকে গেলেন। পুরনো দিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল:

সেন সায়েব বলে এক সায়েব এসেছিলেন এই অফিসে। বেশ মিহি চেহারা, মিহি গলা। অর্থনীতির এম এ.। মানুষকে বড়ো অদ্ভুত কায়দায় তিনি অপমান করতেন। জনৈক মন্ত্রীর এক আত্মীয়কে নিয়োগপত্র ছাড়তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। একদিন কি দু'দিন হলে কিছু বলার ছিল না। মাত্র বারো ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। সেন সায়েব ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আসুন আসুন। কতদিন আপনাকে দেখিনি। কাজে ব্যস্ত থাকেন আপনি। বুঝতেই পারি, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। আপনাদের মত সিনসিয়ার কিছু কর্মী আছে বলেই প্রশাসন এখনও ভেঙে পড়েনি। আরে দাঁড়িয়ে কেন, বসুন বসুন।'

বেল টিপে বেয়ারা ডেকে বললেন, 'এক কাপ চা নিয়ে এসো।' চা এসে গেল। প্রসন্নবাবু ভয়ে ভয়ে একটি চুমুক মারলেন। খুব সাবধানে যাতে কোনরকম শব্দ না হয়। দ্বিতীয় চুমুকের জন্যে কাপটাকে সবে ঠোঁটের কাছে এনেছেন সেন সায়েব পাইপ চিবোতে চিবোতে বললেন, 'কত বয়েস হল আপনার?'

কাপ থেকে ঠোঁট সরে এলো, প্রসন্নবাবু বললেন, 'আর বছর দুই বাকি আছে।'

'তার মানে বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেছেন। ভীমরতি ধরেছে।'

প্রসন্নবাবু আত্মরক্ষার জন্যে সামান্য প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'আজ্ঞে না ভীমরতি ধরবে কেন? এখনও বেশ শক্ত-সমর্থই আছি!'

'বয়েস কত বছর কমিয়েছেন?'

'এক বছরও না।'

'ছেলে মেয়ে কটি?'

'দুই ছেলে এক মেয়ে।'

'সেদিকে হিসেব ঠিক রেখেছেন অ্যাঁ!'

'তার মানে স্যার?'

'এদিকে অপদার্থ হলেও ওদিকে বেশ পদার্থ আছে, কি বলেন?'

'আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তা পারবেন কেন? ইনক্রিমেণ্টটি বন্ধ করে দিলে বুঝতে পারবেন, কত ধানে কত চাল?'

'আমার তো স্যার আর ইনক্রিমেণ্ট নেই। স্কেলের শেষে বহুদিন হল পেঁছে গেছি।'

'এবার তা হলে দয়া করে ভেগে পড়ুন না। চেয়ার দখল করে বুড়ো হাবড়ারা আর কতকাল বসে থাকবে। কিছু ইয়ং ছেলে না এলে চাকায় যে জং ধরে গেল।'

অশোক বসুর পেছনে তামাটে আকাশে সন্ধানী চিল উড়ছে। রোদের প্রখর তাপে গাছপালা ঝিমিয়ে পড়েছে। পুরনো দিনের কথা ভেবে চায়ে চুমুক দিতে আর সাহস হচ্ছে না। বলা যায় না অতীত আবার ফিরে আসতেও পারে।

ছেঁড়া ফাইলটা বাঁধতে বাঁধতে অশোক বসু বললেন, সামনের মাসেই যাতে আপনি পেনসান ড্র করতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব। আর এক মাসের মধ্যেই আপনি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা অবশ্যই পাচ্ছেন। মেয়ের বিয়ের দিন পাকা হল?'

'দর কষাকষি চলছে পাত্রপক্ষের সঙ্গে। ছেলেটি ভালো। যা বাজার দর তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'কিছু ভাববেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সব হয়ে যাবে। আপনি সৎ মানুষ। আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না।'

প্রসন্নবাবু করুণ কণ্ঠে বললেন, বাবা অশোক, এ সব কথার কথা নয় তো! সত্যিই হবে?'

'আপনি দেখুন না, হয় কি না! আর আপনাকে ঘুরতে হবে না। আমারও মেয়ে আছে প্রসন্নদা, আমাকেও একদিন রিটায়ার করতে হবে। ঘুঁটে পুড়লে গোবরের হাসা উচিত নয়।'

বিবর্ণ ছাতাটি বগলে নিয়ে প্রসন্নবাবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা।' অশোক বসু প্রবীণ মানুষটিকে সম্মান জানাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি ভালো করলেই তবে না আমার ভালো হবে? প্রসন্নদা, একদিন সকলকেই যেতে হবে। এখানকার বিচার এখানে না হলে ওখানে গিয়ে-হবেই। সেখানে ঘুস চলে না। খুঁটি ধরে পার হওয়া যায় না।

চারপাশে তাকাতে তাকাতে প্রসন্নবাবু দরজার দিকে চললেন। চেনাজানা যারা ছিলেন, তাঁরা সকলেই যেচে যেচে কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রায় সমসাময়িক হরেনবাবু জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমারও যাবার সময় হল রে! আর এক মাস। বয়েসটা না ভাঁড়ালে তোর সঙ্গেই যেতে হত। তুই তো সাধু, তোর কথাই আলাদা। আমরা ছিলুম ম্যানেজমাস্টার। তা ভাই ম্যানেজ করে কি আর হোলো। বছর কয়েক দাসত্বের কাল বাড়ল। সেই তো মাথা হেঁট করে যেতেই হবে!'

সহকর্মী হরেন উদাস মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। বগলে বিবর্ণ ছাতাটি চেপে ধরে প্রসন্ন বললেন, 'দাসত্বই আমাদের জীবন রে ভাই। এই বাড়ি যেদিন আমাদের ছুটি বলে বাইরে বের করে দিয়েছে, সেদিন থেকে আমরা জীবনেরও বাইরে চলে গেছি। কিছুই আর নেই, শুধু দিন গোনা। ক্যালেণ্ডারের পাতা ওলটানো।'

'নতুন ভাবে বাঁচা শিখতে হবে। একটা কিছু করতে হবে।'

'কিছুই করার নেই রে ভাই। ভাবনাটাই শেষে মরে যায়। জীবনটাই যে পুরনো হয়ে গেছে। পৃথিবীতে শুধু যৌবনের আয়োজন। আমরা স্টেজের বাইরের চরিত্র এখন। দর্শকের আসনে বসে থাকা। আমরা তেমন বড় হতে পারিনি। একেবারেই

মিডিয়কার। কীর্তনের দলের দোহর দেখেছিস? মূল গায়েন গাইলে, রাধার এ কি হোলো। দোহারা অমনি গেয়ে উঠল এ কি হোলো। আমরা হলুম সেই দোহার। এ কি হোলো করার জন্যেই জন্মেছি।'

প্রসন্ন অফিসের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। শহর যেন রোদের উত্তাপে পরিশ্রান্ত বলদের মত ধুঁকছে। ট্রাম চলেছে নড়বড়, নড়বড় করে। যৌবনে এই সময়টায় তিনি অফিসের বাইরে টিফিন করতে বেরোতেন। চারপাশে সবই রয়েছে। সেই কাটাফল, চিঁড়ে, মুড়ি, ছোলা, বাদাম ভাজা। আখের রস। তেলেভাজা, আলুর চপ, জিলিপি। সার সার মিষ্টির দোকান, পান, সিগারেট, ঠাণ্ডা জল। সবই সেই আগের মত। নাটক চলছে, চলবে। এক প্রসন্ন যায়, তো শত প্রসন্ন আসে। জীবন অনেকটা পায়ের কড়ার মত। যতই কাটো কেন, আবার ঠিক গজাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে রাজভবনের সামনে দিয়ে বৃদ্ধ প্রসন্ন টুকটুক করে হেঁটে বাস রাস্তার দিকে এগোতে লাগলেন। আজ আর তেমন হতাশ বোধ করছেন না। টাকাটা পেলে মেয়েটাকে সামনের শীতেই পার করবেন! আর বহু দিনের ইচ্ছে, হরিদ্বারটা একবার ঘুরে আসবেন। সুষমারও যেমন বরাত!

সেই চড়চড়ে রোদে, পিচগলা রাস্তায় হঠাৎ বউয়ের কথা মনে পড়ল। কম সহ্য করেছে! বেচারা আর পারে না। বয়েস বেড়েছে। নানারকম মেয়েলি রোগে ধরেছে। মেজাজ তো একটু খিটখিটে হবেই! কত আর খরচ হবে, হাজার, দু'হাজার! সস্ত্রীক ঘুরে আসবো হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরী। শরীর নিলে কেদারনাথ। জীবনে একবার, মাত্র একবার সঞ্চিত অর্থের বেহিসেবী খরচ। বেহিসেবী কেন? এ তো আমার উপার্জন। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে চোখের সামনে ভাসতে থাকবে তুষারশুভ্র হিমালয়। সংসার নয়, জীবনের চাওয়া, পাওয়া না-পাওয়া নয়, স্যাঁতসেঁতে দেয়াল নয়, হিমালয় দেখতে দেখতে নিঃশব্দে সরে পড়া।

হাওড়াগামী একটা ভিড় বাসে টুক করে লাফিয়ে উঠলেন। হিমালয়ের কথা ভেবেই বাতাক্রান্ত পায়ে কেমন জোর এসে গেছে। বগলের ছাতা কণ্ডাকটারের কোমরে খোঁচা মেরেছে। শঙ্কিত

হলেন। এই সামান্য অসাবধানতার ফলে কত কথাই না শুনতে হবে। খিস্তি করে ভূত ভাগিয়ে দেবে। কেরানীর কি যে অভ্যাস! সারা জীবন বগলে ছাতা, হাতে একটা নরম কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ! সাধে লোকে কেরানীকে ঘেন্না করে!

কণ্ডাকটার ছেলেটি কিন্তু কিছুই বলল না। বরং ভেতরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল। অবাক হলেন! এমন তো আজকাল হবার নয়। এখন তো তেরিয়া-মেরিয়ার যুগ। ভেতরে ঢোকার সময় আর একপ্রস্ত অবাক হবার পালা। ঢুঁ মেরে, গোত্তা মেরে, পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে, এপাশ, থেকে ওপাশ থেকে ছোঁড়া তীক্ষ্ন বাক্যবাণ সহ্য করতে করতে, বাসের মধ্যে নিরাপদ মধ্যাঞ্চলে যেতে হল না। যাত্রীব্যূহ মন্ত্রবলে যেন দু'ভাগ হয়ে গেল, যেন সেই যমুনা! বৃদ্ধ প্রসন্ন কৃষ্ণ কোলে নন্দের মত অক্লেশে ঢুকে গেলেন। শুধু তাই নয়, বেশ রাগী রাগী চেহারার স্বাস্থ্যবান একটি যুবক সরে গিয়ে সুন্দর এবং সুস্থভাবে দাঁড়াবার মত জায়গা ছেড়ে দিলেন।

বাস চলেছে। প্রসন্নবাবু চলেছেন। একটা হাত ছাতা সামলাচ্ছে আর একটা হাত টাল সামলাচ্ছে। অসুবিধে হচ্ছে। হলেও কিছু করার নেই। এই ভাবেই যেতে হবে। মধ্যবিত্ত মানুষকে কোনু সরকার এর চেয়ে বেশি সুখে রাখবে! ইংরেজ রেখেছিল। সে সময় দেশ বড় ছিল। জনসংখ্যা কম ছিল। ভয়ও ছিল সমালোচনার। সামনের আসনের পাশের দিকে যে যুবকটি বসেছিল, সে হঠাৎ বললে, 'আপনার ছাতা আর ঝোলাটা আমার হাতে দিয়ে, দু'হাতে ভালো করে ধরে দাঁড়ান।'

প্রসন্নবাবু নির্দেশ পালন করলেন। এ এমন কিছু অবাক প্রস্তাব নয়। শহরবাসী যত স্বার্থপরই হোক এটুকু এখনও করে। এতেও অবশ্য স্বার্থ আছে। মুখের কাছে, কাঁধের কাছে, হাঁটুর কাছে কিছু ঠেকলে অস্বস্তি হয়। যুবকটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি বসুন।'

'কেন বাবা! তুমি নামবে?'

'না নামবো কেন? আপনি বসুন। আপনাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গরমে ঘামছেন। বসলে একটু বাতাস পাবেন।'

'না, বাবা, না, তুমি বোসো আমি বেশ আছি।' প্রসন্নবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন। কারুর দয়া তিনি চান না। নিজের জোরে বাঁচতে চান।

ছেলেটি শুনলো না। জোর করে বসিয়ে দিল। 'আমার দাঁড়াবার বয়েস। আপনি পিতৃতুল্য। আপনি বসলে আমার শান্তি।'

'এসব আজকাল কেউ আর মানে না বাবা।'

'আজ না মানুক একদিন আবার মানতে হবে। এখন সব নেশায় আছে। ঘোর একদিন কাটবেই!' ছেলেটির কথা শুনে প্রসন্নবাবুর চোখে জল এসে যাবার উপক্রম হল। আজ পৃথিবীর হল কি। সিন্দুকের ডালা খুলে পুরনো দিনের সব অলঙ্কার বেরিয়ে পড়ছে নাকি! জড়োয়ার কাজ করা সাবেক কালের বেনারসী, টায়রা বাজুবন্ধ, চন্দনকাঠের জাফরি টানা ময়ূর পাখা। মানুষে মানুষ তা হলে আবার ফিরে আসছে?

প্রসন্নবাবু যার পাশে বসলেন, তিনি একজন গোলগাল মধ্যবয়সী মানুষ। তিনি আরও অবাক করে দিয়ে বললেন, 'জানালার ধারে বসবেন? আরও বেশি হাওয়া পাবেন।'

প্রসন্নবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না ভাই, এই বেশ আছি। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'যাবেন কতদূর?'

'কদমতলা।'

বাস ব্রিজে উঠে পড়ল। গঙ্গার ফুরফুরে বাতাস আসছে। বাসের দুলুনিতে ঢুল ধরছে। একবার বোধ হয় পাশের ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে গালাগালি খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ভদ্রলোক কিছুই বললেন না। স্নেহ মিশ্রিত দৃষ্টিতে শুধু একবার তাকালেন।

কদমতলায় নেমে দু পা এগোতেই, পেছন থেকে একটা মটোর গাড়ি এসে দাঁড়াল। চালকের আসন থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন বললে, 'জ্যাঠামশাই, উঠে পড়ুন।'

ছেলেটির নাম মোহর। বড় লোকের ছেলে। অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি। যেচে কোনওদিন কথাই বলেনি। এভাবে গাড়ি থামিয়ে লিফট দেওয়া তো দূরের কথা! প্রসন্নবাবু সামনের আসনে ভয়ে

ভয়ে উঠে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। জীবনে একবার না দুবার মটোর চেপেছেন। মটোরে চাপারও কায়দা আছে। গুড়ি মেরে, শরীরটাকে সামনে ঠেলে, পাশে মোচড় মেরে আসনে ফেলতে হয়, তারপর পা-টিকে টুক করে ভেতরে তুলে নিতে হয়। দরজা বন্ধ করারও কায়দা আছে! প্রসন্নবাবুর মাথা ঠুকে গেল। ছাতি আটকে গেল। অনেকটা হুমড়ি খেয়ে ভেতরে এলেন। লজ্জার ব্যাপার! সারা জীবন বড়লোক থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন। আজ একেবারে পাশাপাশি। মোহরের অঙ্গ থেকে বেশ একটা সুবাস বেরোচ্ছে। পাশে পড়ে আছে দামী সিগারেটের প্যাকেট। সোনালী লাইটার। পেছনের আসনে কি একটা শুইয়ে রেখেছে টুংটাং শব্দ হচ্ছে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে মোহর বললে, 'দুএক দিনের মধ্যে বাবা বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কেন বলো তো?' প্রসন্নবাবু ভয় পেলেন। বড়লোক তো অকারণে কিছু করেন না। তাদের সময়ের অনেক দাম। পূর্ব-পুরুষের রেখে যাওয়া কোনও দেনা নেই তো! এত দিনে হয়তো খুঁজে পেয়েছেন।

মোহর বললে, 'যদ্দুর মনে হয়, বাবা একজন সৎ মানুষ খুঁজছেন। আমরা যে ব্যবসা করি, সেই ধরনের ব্যবসায়ীদের একটা সমিতি আছে। সেই সমিতিতে উনি অ্যাকাউণ্টেণ্ট হবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবেন। অনেক দিন ধরেই ভেবেছেন, আপনার জন্যে একটা কিছু করা দরকার। আমাকে দু'তিন দিন বলেছেন। আজ আপনি বাড়ী আছেন?'

'আমি তো সব সময়েই বাড়িতে। কোথায় আর যাবো বাবা!'

'তা হলে আজই আসবেন, ধরুন আটটা থেকে নটার মধ্যে।'

বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে মোহর চলে গেল। প্রসন্নবাবুর মনে হল, বেশ শরীরে বল পাচ্ছেন! যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, সে মাটি আর তেমন টলছে না। মোহরের পিতা জহরবাবু সত্যই যদি একটা চাকরি দেন, তাহলে সেই ইচ্ছেটাকে মনের সুপ্ত কোণ থেকে আর একবার টেনে বার করে আনবেন। ছোট্ট একটি

মাথা গোঁজার ঠাঁই। জীবনে বড় বাগানের শখ ছিল। একটুকরো জমি পেলে ফুলের হাসি দেখতেন। দু'পাশে দুটি মন্দির ঝাউ। এক চিলতে পথ। নানা বর্ণের জবা। টগর। মল্লিকা। শীতে প্রজাপতি উড়বে।

বসার ঘরে এক প্রৌঢ় বসে আছেন। সামনে গেলাস। চায়ের কাপ। পেছন থেকে দেখে বুঝতে পারেননি। বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি। আঙুলের আঙটিতে আলো খেলছে। সামনে এসে চিনতে পারলেন। শিশিরবাবু। সাঁতরাগাছির সেই শিল্পপতি। এ'রই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের দুরাশা এখনও নাড়াচাড়া করছেন। বিজ্ঞাপন মারফত যোগাযোগ। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। পছন্দ না হয়ে উপায় নেই। প্রসন্ন, তোমার মেয়েভাগ্যটি বড় ভালো! একথা সারা জীবন তিনি শুনে এলেন। মেয়েটিকে দেখে নিজেরও তাই মনে হয়। ভুল করে অথবা শখ করে এক রাজকুমারী এই দুঃখের সংসারে এসে পড়েছে।

'কী সৌভাগ্য! কতক্ষণ এলেন?' প্রসন্নবাবু হাত জোড় করলেন। মেয়ের পিতার যেমন করা উচিত।

শিশিরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'আরে আসুন আসুন। বেশ কিছুক্ষণ এসেছি। বসুন, বসুন, খুব গুরুতর কথা আছে।'

প্রসন্নবাবু ছাতাটিকে মেঝেতে শুইয়ে রেখে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসলেন। কি এমন কথা! একটা শুকনো ছোট্ট একটি পাতার কুঁড়ি মুখ তুলেছিল, আজ বোধহয় সেটিও শুকিয়ে গেল। গরিবের দুরাশায় যতই জল ঢাল, কিছুই হবার নয়।

শিশিরবাবু উল্লাসের গলায় বললেন, 'প্রস্তুত!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রস্তুত?'

'কি বলুন তো?'

'আজ্ঞে, হয়ে গেল। যা হবার নয়, তা হবার নয়।'

'খুব বুঝেছেন যা হোক। বাড়িতে পাঁজি আছে? শুভস্য শীঘ্রং।'

'পাঁজি? শুভ? কি বলছেন আপনি?'

'সামনের শ্রাবণেই। শীতের জন্যে আমি আর অপেক্ষা করব না।'

'তার মানে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি তো!'

'হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছেন। আমার কোনও দাবি নেই। যা দেবেন। শাঁখা সিঁদুর হলেও আপত্তি নেই। ওই মেয়েই আমার পুত্রবধূ হবে।'

'ভুল করছেন না তো?'

'ভুল! কাল রাতে আমি কী স্বপ্ন দেখেছি জানেন। কোজাগর। পূর্ণিমার রাত। আপনার মেয়ে মা লক্ষ্মীর বেশে, কোলে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আমাদের বাড়ির উঠনে দাঁড়িয়ে। কী অপূর্ব তার রূপ! যেখানে তার পা পড়ছে, সেই জায়গাটাই স্বর্ণময় হয়ে যাচ্ছে। ভোর হতেই গুরুদেবের কাছে ছুটলুম। তিনি বললেন, মা আসতে চাইছেন, আর দেরি নয়।'

'কি বলছেন আপনি?'

'থেকে থেকে আপনি কি বলছেন, কি বলছেন করবেন না। বেয়ানকে ডাকুন। শাঁখ বাজান, শাঁখ বাজান। আজ বড় আনন্দেব দিন।'

'আমি যে বড় গরিব!'

'সেইটাই তো আপনার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য। সেইজন্যেই তো আপনি খাঁটি মানুষ। ধনী হলে আপনার মেয়ে হত আপস্টার্ট, আপনি হতেন দু'নম্বর কারবারি। পাঁজিটা একবার আনান না মশাই।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ সব পাকা করে শিশিরবাবু উঠে যেতে না যেতেই জহরবাবু এলেন। ছফুট লম্বা। চোখে গোলড ফ্রেমের চশমা। পরনে ধবধবে ধুতি, পাঞ্জাবি। ধনী মানুষকে প্রসন্নবাবু ভয় পেতেন। তাঁরা সাধারণত অহঙ্কারী হন। বড় বড় কথা বলেন। পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। জহরবাবুকে দেখে তা মনে হল না। বিনীত, নিরহঙ্কার। চেয়ার টেনে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন?'

'বয়েসের তুলনায় ভালই।'

'ভেরি গুড। রিটায়ার করার পর সাধারণত মানুষ বড় ভেঙে পড়ে। ছেলে কিছু বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপত্তি নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনাকে আমরা মাসে হাজার করে দেবো। তার বেশি আপাতত সম্ভব হবে না।'

'হাজার!' প্রসন্নবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'কেন কম হয়ে গেল?'

'আজ্ঞে না, আমি ভাবতেই পারছি না।'

'দিন কতক পরে, ধরুন পুজোর সময়, আরও একটু বাড়াতে পারব। কাল থেকে তা হলে লেগে পড়ুন।'

'বেশ।'

'গাড়ি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। গাড়িই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এই বয়েসে আর বাসট্রাম ঠ্যাঙাতে হবে না।'

'আজ্ঞে।' প্রসন্নবাবুর সামনে সব কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে এতকালের পরিচয় তার চেহারা তো এরকম নয়! জহরবাবু কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ। কথা পাকা করে উঠে চলে গেলেন। প্রসন্নবাবুর মনে হতে লাগল, সংসারের ওপর দিয়ে ফুর-ফুর করে বসন্তের দখিনা বাতাস বইছে। সাবেক কালের আলমারির মাথায় বসে কোকিল ডাকছে মিহি সুরে। এ সুখ এতকাল ছিল কোথায়!

রাতের আহারে বসেছেন। রুটি আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। সামনে বসে স্ত্রী সুষমা। এক সময় স্ত্রী সুন্দরীই ছিলেন। এখন সংসারের আঁচে পিতলের প্রতিমার মত ঝলসে গেছেন।

মুখে রুটি ঠুসে প্রসন্ন বললেন—

'সবই তাহলে হল?'

'ভগবান মুখে তুলে চেয়েছেন।'

'বড় দেরিতে, বুঝলে, বড় দেরিতে।'

'তা হোক, কথায় বলে, সব ভালো যার শেষ ভালো।'

'এখন হাজার দেবে বুঝলে! পুজো নাগাদ আর একটু বাড়বে। এবার থেকে কুমড়োর ঘ্যাঁটে তুমি একটু ছোলা দিও, আর নামাবার সময় এক চামচে ঘি দিয়ে সাঁতলে নিও। বেশ টেস্ট হবে।'

'তুমি কুমড়োয় ছোলার কথা ভাবছ, আমি ভাবছি খান ছয়েক কয়ে ফুলকো লুচির কথা। হাজারে আমাদের দু'জনের বেশ ভালই চলে যাবে। রোজ একটু করে দুধ, এক টুকরো মাছ এ বয়েসে দরকার বুঝলে?'

'আমি আবার একটু অন্য রকম ভাবছি। আর একটু দূর ভবিষ্যতের কথা। পঞ্চাননতলায় সিধুরা সেই বিশাল পুকুরটা বুজিয়ে প্লট প্লট করে বেচছে। পি এফ আর গ্র্যাচুয়িটির টাকাটা থেকেই যাবে। মেয়েটাকে তো ওঁরা এমনিই নিয়ে চললেন। ওই টাকাটায় ছোটখাটো একটা একতলা বাড়ির কথা ভাবলে কেমন হয়! আমার অবর্তমানে তোমাকে দেখবে কে?'

'আঃ, তুমি ওসব অলুক্ষণে কথা বোলো না বাপু। কে আগে যাবে, তোমার জানা আছে?'

'বয়েসে তোমার চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড় আমি। গণিতের হিসেবে, চাকরির নিয়মে আমারই ডাক আসবে আগে। অফিসে ছাঁটাইয়ের সময় বলত, লাস্ট কাম ফাস্ট সার্ভড আর রিটায়ারের সময় বলত, লাস্ট কাম ফাস্ট সার্ভড। যাক ওসব বাজে কথা। এতকাল আমরা যে খাওয়ায় অভ্যস্ত সেটাকে আর পালটে দরকার নেই। শরীর ওই সুরেই বাঁধা হয়ে গেছে। বরং দেরিতে হলেও ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক। ধরো আমি যদি নব্বই বছর বাঁচি। হ্যাঁগা, একটু গুড় আছে নাকি? শেষ রুটিটা তা হলে!'

'গুড় নেই গো, একটু চিনি নেবে? বোসো রস করে দিচ্ছি।

'না না, চিনির অনেক দাম।'

'এখনও তুমি দামের কথা ভাবছ। সামনের মাস থেকে তো।'

'এখনও সবই হাওয়ায় ভাসছে সুষমা, পৃথিবীকে আমি তেমন বিশ্বাস করতে পারি না। বড় বেশি নাটক এখানে। কাপে আর ঠোঁটের চুমুকে অনেক ফসকাফসকির ব্যাপার থাকে। দাও, আর এক গেলাস জল দাও। এখন কি আর আমাদের ভোগের বয়েস আছে! ত্যাগের বয়েস।'

হাতমুখ ধুয়ে প্রসন্নবাবু চৌকিতে বসে স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তা হলে কোমর বেঁধে লেগে পড়। শ্রাবণ আর মাত্র দু'মাস। মৌ কোথায়? শুয়ে পড়েছে?'

'শোবে কি গো? ও তোমার পাঞ্জাবির গলায় তালি মারছে, কাল তো তোমার বেরনো! এ আর তোমার সেই সরকারী অফিস নয় যে ছেঁড়া ট্যানা পরে যাবে। যাবে গাড়িতে, আসবে গাড়িতে, তুমি বাপু সবার আগে দু-একটা ভালো ধুতি-পাঞ্জাবি করাও।'

'হ্যাঁ সে তো করাতেই হবে। অনেক দিনের শখ, তোমাকে দু'একটা ভালো শাড়ি পরাই, মেয়েটাকে একটু সাজাই। মেয়ের ভাবনা অবশ্য আমাকে আর ভাবতে হচ্ছে না। জামাই বাবাজী ভাববে! আচ্ছা, আমি তাহলে শুয়ে পড়ি কি বল! আজ একটু বিশ্রাম নিই। অনেক দিন পরে, কাল থেকে আবার বেবনো। হ্যাঁগা, রোজ দাড়ি কামাতে হবে নাকি?

'তা হবে না! মার্চেন্ট অফিসে চকচকে মুখ চাই।'

'তা হলে, তুমি বাপু আমাকে সকাল সকাল ডেকে দিও কেমন? সব অভ্যাস প্রায় ভুলে এসেছি।'

ছোট খাটটিতে প্রসন্নবাবু মশারির একটি পাশ তুলে ঢুকে পড়লেন।

মহুয়া বড় হবার পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর শয্যা আলাদা হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এই একক ব্যবস্থায় বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। এখন সয়ে গেছে। কত কি ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুম এসে যায়। আজ মনে মনে ভাবলেন, বিছানা, বালিশ, মশারি সব কিছুর চেহারা এবার পালটে ফেলবেন। শয্যা মানুষের একটা বিলাস। অনেক বাড়িতে দেখেছেন, বিছানার কি কায়দা। ছোবড়ায় গদি, ফুলো তোশক, বাহারি চাদর, সুন্দর বালিশ। দেখলেই মনে হয়, আঃ, বলে শুয়ে পড়ি।

বহুকালের তোশক। জায়গায় জায়গায় তুলো সব গুটিয়ে পাকিয়ে ড্যালা ড্যালা হয়ে গেছে। দাম্পত্য জীবনের কত দুঃখের, কত সুখের স্মৃতি জমে আছে এই রঙ্গভূমির মত শয্যাভূমিতে। এখানে যৌবনের দিন ঝরে গিয়ে পড়ে আছে পত্রহীন শুষ্ক কঙ্কাল।

বালিশে মাথা রেখে আজ বেশ একটা সুখানুভূতি আসছে। ঘর অন্ধকার হলে আশেপাশের আলো, শব্দ এসে ঢুকছে। বেশ লাগছে! এমন ভাল বহুদিন লাগেনি। প্রসন্ন? নিজেকেই নিজে ডাকলেন। এতদিনে তা হলে একটু সুখের মুখ দেখবে!

শুকনো ডালে আবার দু'একটি সবুজ পাতা আসবে! শরীরে আসবে চেকনাই। যা যা ভোগ করা হয়নি, একে একে সব ভোগ করবো। মহুয়া শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে, সুষমা আবার পাশে এসে শুতে পারবে!

'তোমার জল চাপা রইল।'

সুষমা জলের গেলাস রেখে চলে গেল। বাইরে মা আর মেয়ে কথা বলছে। কানে ভেসে ভেসে আসছে। বেশ একটা পূর্ণতার অনুভূতি আসছে। আঃ, চোখের সামনে কত কি দৃশ্য ভেসে আসছে। বেনারসী পরে মহুয়া চলেছে শ্বশুরবাড়ি। হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে বসে আছি, আমি আর সুষমা। পঞ্চাননতলার জমিতে বাড়ির ভিত উঠেছে। নাঃ, তোশকটাকে ধুনিয়ে, নরম, সমতল একটা বিছানা তৈরি করাতেই হবে। তুলো ধোনা দেখতে বেশ মজা লাগে। টংটং করে টঙ্কারের শব্দ। তুলো উড়ছে ফুরফুর করে। জীবনের দুঃখ আর সুখ টঙ্কারের শব্দে উড়ছে, আবার এসে জমা হচ্ছে একই জায়গায়। পাঁজা পাঁজা তুলো।

বুকের বাঁ দিকে টং করে একটা শব্দ হল। মাথায় যেন বেজে উঠল স্কুল-ছুটির ঘণ্টা। সব যেন হুই হুই করে বেরিয়ে আসছে, ছুটি ছুটি। কানের কাছে জাহাজের ভোঁ বাজছে। পাটাতনে নোঙর তোলার শব্দ। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকার চেষ্টা করলেন, সুষমা, তুমি কোথায়? এ যে ভীষণ অন্ধকার! তুমি আমার হাতটা ধর। মহুয়া। ধুনুরির টঙ্কার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল। তুলো উড়ছে রাশি রাশি। আর কিছু মনে রইল না।

না থাকারই কথা। প্রসন্নবাবুর ছুটি হয়ে গেল। সুষমা তখনই কিছু জানতে পারল না। কাল যে মানুষটা বেরোবে, তার জন্যে পরিষ্কার ধুতি চাই, পাঞ্জাবি চাই, রুমাল চাই, একটা গেঞ্জি চাই, জুতোর চেহারাটা একটু ভাল না হলে চলে! নটার মধ্যে খেতে বসাতে হবে। সময়ে রান্নার অভ্যাস আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। মা আর মেয়েতে যখন টুকি-টাকিতে ব্যস্ত, প্রসন্নবাবু তখন নিঃশব্দে চলে গেলেন। হৃদয়হীন হৃদয়ের কারসাজি।

সকালে মানুষটিকে নতুন কর্মস্থলে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি এলো ঠিকই, তবে এ গাড়ি সে গাড়ি নয়। এ হল ছুটির পর ঘরে

ফিরে যাবার গাড়ি। ফুলে ঢাকা প্রসন্ন সিদ্ধান্ত, যেদিকে যাবার কথা সেদিকে না গিয়ে বিপরীত দিকে চলে গেলেন।

পাখিরা চিরকালই কথা বলে। সেকালের মানুষ সে ভাষা বুঝত। একালের মানুষ বোঝে না। বুঝলে, শুনতে পেত, প্রসন্নবাবুর বাড়ির কারনিসে বসে দুটি পাখি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

'লোকটি সুখ নিয়ে চলে গেল, দুঃখ নিয়ে আবার যেন ফিরে না আসে!'

দ্বিতীয় পক্ষ

আমার প্রথম পক্ষের বউটি ছিল বড় সাদাসিধে। টাটকা পাঁউরুটির মতো নরম তুলতুলে। ফোলা ফোলা গাল। কাঁচের মতো চোখ। বড় বড় চোখের পাতা। ফর্সা ধবধবে রঙ। খুব নিচু গলায় কথা বলতো। ধীর চলন। ধীর বলন। সবাই বলতো, আহা, মা লক্ষ্মী যেন পট ছেড়ে নেমে এসেছে। শোভনের কি ভাগ্য! এ যেন বানরের গলায় মুক্তোর মালা। আমি ঠিক বানর নই, তবে গো হাড় গিলের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনটা কেমন কেমন করে ওঠে। এই যদি মানবের চেহারা হয় দানব কাকে বলে। এতখানি একটা বুকের ছাতি। এক ইঞ্চিও খালি নেই। সর্বত্র কুঁচি কুঁচি লোম। মুখটা কেমন চোয়াড়ে মার্কা। এমন একটা অকাবিব্যক চেহারা খুব কম দেখা যায়। হাসলে মুলোর মত দাঁত বেরিয়ে পড়ে। চোখের দৃষ্টি যেন, আবার খাবো সন্দেশ। সব সময়েই ঘোলাটে লাল। নেশা ভাঙ না করেই এই অবস্থা। করলে কি হত।

আমার দোষ নেই। আমার যখন যৌবন আসছে। বয়স লেগে গলা ভারি, ঠোঁটের ওপর কচি গোঁফের রেখা, সেই সময় এক ব্যায়াম বীরের পাল্লায় পড়ে মিস্টার ইণ্ডিয়া হবার ইচ্ছে হয়েছিল। সেই সময় আমি ডেলি একশো ডন, দুশো বৈঠক মারতুম। ডাম্বেল, বারবেল, প্যারালালবার, রোমান রিং নিয়েও কস্তাকস্তি চলত। শরীরের যেখানে যত মাংস পেশী ঘুমিয়ে ছিল সব ঠেলেঠুলে উঠে

পড়ল। নিজেই অবাক, মানুষের এত সব থাকে! বেশ মজা লাগতো। নেশাও ধরে গিয়েছিল। রোমান রিং করতে গিয়ে চোয়াল ভেঙে যাচ্ছিল, সে খেয়াল ছিল না। দেখতে দেখতে একটা হেঁড়ে মতো লোক হয়ে গেলুম। হাতুড়ি পেটানো চেহারা।

শরীর যখন সেট করে গেল তখন আমার ব্যায়াম গুরু বললেন, হলো বটে, তবে কি জানো গরিবেরা যা হয়, ঘি, দুধ, মাখন, ডিম, ছানা তো তেমন পড়ল না, তার ফলে শরীরটা একটু পাকতেড়ে হয়ে গেল। খুব ইচ্ছে সিনেমার হিরো হব। হল না। আমার দোষ নয়। দোষ বাঙলা ছবির চলনের। মেয়ে মেয়ে চেহারা না হলে হিরো হওয়া যায় না। গাছের ডাল ধরে বাঁকা শ্যাম হয়ে দাঁড়াতে হবে আর পেঁয়াজ খোসা শাড়ি পরে নায়িকা বেসুরো গান গাইবে, তুমি আমার আমি তোমার হে রে রে রে করে একবার এ গাছের ডাল ধরে কেতরাতে কেতরাতে ওগাছ, সে গাছের ডাল ছুঁয়ে ছুয়ে আদিখ্যেতা করবে। বেশি ছোটাছোটি করতে পারবে না, কারণ কোমরে বাত। হেঁপো নায়ক বেতো নায়িকা। শুকনো গাছের ডাল। ফুচকে ডিরেকটার। এক ডিরেকটার বললে, এ দেশে যখন র‍্যাম্বো হবে তখন তোমার মতো ঘোড়ার দরকার হবে। এখন ডন বৈঠক চালিয়ে যাও। এখনকার স্ক্রিনে ওই চেহারা গান গাইছে দেখলে অডিয়েনস মূর্ছা যাবে। উত্তমকুমারের যুগ ভাই, এখানে খাপ খুলতে এস না।

মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াই। না হল সিনেমা। না হল প্রেম। ডিরেকটারদের কত বোঝালুম, মশাই, যে কোনও ওজনের নায়িকাকে আমি ঝাড়া তিন ঘণ্টা, পায়ের তলায় আর মাথার তলায় হাত দিয়ে তুলে পাঁজা কোলা করে রাখতে পারি। ট্রায়াল দিয়ে দেখুন। এ হল বারবেল ভাঁজা হাত। অন্য যে কোনও নায়ক পারবেই না। হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। আমি ওয়েট লিফ্‌টার। ডিরেক্‌টার বললেন, তোমার অ্যাপ্রোচে ভুল হচ্ছে। নায়িকারা বারবেল নয়। সিনেমা ব্যায়ামাগার নয়। আমাদের সিনেমায় দুটোই সাবজেক্ট, প্রেম আর ব্যর্থ প্রেম। এইবারে কেরামতি করতে গেলেই ফ্লপ। ছোট খাটো দু একটা প্রেম করতে গেলুম। বাবা, সেখানে যা কম্পিটিশান! চাকরির বাজারকেও হার মানায়।

একটা পোস্ট, এক হাজার অ্যাপ্লিক্যান্ট। শেষে একটা কারখানা করে ফেললুম। আমার ওই লোহালোক্কড় আর নাট বল্টুই ভালো। প্রাণ খুলে ঘষা যায়। টাইট দেওয়া যায়। গ্রুপ কাটা যায়। আর আমার ব্যায়াম গুরুর রয়্যাল এনফিল্ড মটোর বাইকটা কিনে নিলুম। ব্যাপারটা বেশ জমে গেল। বাঙলা ছবিতে নায়িকা তুলে আমার ক'পয়সা হত। যা হত তাও আবার ট্যাক্সে যেত। মালে উড়ত। এ তবু লোহা তুলে দুটো পয়সার মুখ দেখলুম। বাড়ি হল। ভুরভুরে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি হল। গাড়িটা মটোর সাইকেলের মতো শব্দ করলেও চলে। ধমকাতে ধমকাতে চলে। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দেয়। একবার এক সাহেব আমার গাড়ি চেপে বলেছিলেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এর একটা নিজস্ব ক্যারেক্টার আছে।

চেহারার গরমের সঙ্গে টাকার গরম। ডবল গরমে ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে গেল। আমাদের ফ্যামিলিটা চিরকালই একটু গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপ। আমার বাবার এমন গোঁ ছিল যে সবাই বলত রাইনোসেরাস অফ নর্থ ক্যালকাটা। আমার মা আবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জেলার মেয়ে। যেমন রাগী তেমনি গম্ভীর। ফলে আমার মেজাজও সেই রকম হয়েছে? আমি আমার মা দুজনে মিলে আমার সেই প্রথম পক্ষের তুলতুলে বউটাকে ধামসে ধামসে শেষ করে দিলুম। বেড়ালের যা স্বভাব, নরম নাটি দেখলেই আঁচড়াবে।

বাবা চলে যাবার পর মা একটু আয়েসী হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া যারা একটু ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে তারা নিষ্ঠুর হয়। হতেই হবে। সারা দিন মালা জপে জপ করতে করতে মন ইষ্টমুখী। ইষ্ট ছাড়া আর কাউকে ভালবাসা অন্যায়। ধার্মিকরা মানুষকে সেবাপরায়ণ হতে বলেন। আমার প্রথম পক্ষের বউ সেবা করে করে, সেবা করে করে কাহিল হয়ে পড়ল। আর আদর্শ স্বামী হল ওভারসিয়ারের মতো। তার কাজ হল বউ সংসারে কাজ করছে কিনা দেখা। পান থেকে চুন খসলেই হম্বিতম্বি করা। ছড়ি ঘোরানো। আমার মতো একটা স্বামী তো আর স্ত্রৈণ হতে পারে না। মাঝে মধ্যে হাতটাতও চালিয়ে দিতুম। ফোঁসফোঁস করে

কাঁদত। বড় বড় চোখের পাতা জলে ভিজে বেশ দেখাত। সে আর এক বিউটি। সকলে আমার প্রশংসাই করত। সবাই বলত, এ দেখি রামভক্ত হনুমান নয়, মা ভক্ত ভোম্বল। আমার ডাক নাম ভোম্বল।

আমরা তাকে সেবাপরায়ণা, সহনশীলা, সতীসাধ্বী করতে চেয়েছিলাম। এ কথা তো ঠিক সংসারের কড়ায় বেশ করে ভাজা ভাজা করতে না পারলে মেয়েরা খোলতাই হয় না। মানুষও তো চামড়া। কাঁচা চামড়াকে কষা হরীতকীর জলে অষ্টপ্রহর ভিজিয়ে রেখে পাকা করতে হয়। তা করব কি? সে মরেই গেল। আমার খুব দুঃখ হল। মা বললে, ছেলেদের অত নরম হলে চলে না। সবাই কি আর সব কিছু নিতে পারে! পারে না। পরীক্ষায় ফেল করেছে। হেরে গেছে। আত্মহত্যা করেছে। দেখিস নি অনেক নতুন কাপড় এক ধোপেই ছিঁড়ে যায়। আমরা তখন বলি, ধোপে টিকল না।

সত্যি আমার মা সিদ্ধিলাভ করেছে। তা না হলে এমন সুন্দর সুন্দর কথা বেরোয়! ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো। মায়ের কথায় ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরে আমার বন্ধু বিভাসের কি হল! ইণ্ডিয়ান নেভিতে চাকরি পেয়ে চলে গেল। এক মাসের মধ্যে ন্যাড়া মাথা হয়ে ফিরে এল। আমরা বললুম, এ কি রে! বিভাস বললে, ভাই, প্রথমেই তো চুল কদমছাঁট করে দিলে। তারপর সে কি ট্রেনিং রে ভাই! মাস্তুল বেয়ে ওঠো মাস্তুল বেয়ে নামো। দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে এ জাহাজ থেকে ও জাহাজে যাও। একটা জাহাজের গোটা ডেক জল আর বুরুশ দিয়ে ঘসে ঘসে ধোও। সে যে কি কাণ্ডরে ভাই! পালিয়ে এসেছি। তা পালাবো বললেই কি পালানো যায়। বিভাসকে আবার পাকড়াও করে নিয়ে গেল। তারপর কি হল জানি না! বিভাস পালিয়েএসেছিল আই. এন. এস বিক্রম থেকে। আমার বউ পালালো আমাদের বিক্রম থেকে।

আজকাল বাড়ি যেমন খালি পড়ে থাকে না। থাকার উপায় নেই। রোজগেরে ছেলেও তেমন পড়ে থাকে না। প্রথম প্রথম দিন কতক লোকে রাস্তায় ঘাটে আঙুল তুলে দেখাত, ওই দেখ, ওই

লোকটার বউ আত্মহত্যা করেছে। মায়ের নামেও নানা কথা বলতো? 'মুখে হরি বলি, কাজে অন্য করি'। শুনিয়ে শুনিয়ে গান গাইতো। আমার পাশের বাড়িতে একটা ডেঁপো মেয়ে আছে। সেই মেয়েটাই বেশি গাইতো। কি করবো, এ সবের তো প্রতিবাদ চলে না। মা বলতেন, সহ্য কর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গেছেন শ. ষ স। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। কেউ কেউ আবার গল্প শোনাতো, 'আহা কত্তার কি দয়ার শরীর?' গল্পটা আমার জানা। তিন ছেলে চোরকে ধরে পেটাচ্ছে! চোরের আর্তচিৎকার শুনেও কত্তা দোতলা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। নিচের উঠনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরে তোরা করছিস কি! তোদের কি এতটুকু দয়ামায়া নেই! কৃষ্ণের জীব। ধরে পেটাচ্ছিস! ওটাকে বস্তায় ভরে, মুখে দড়ি বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আয়!' চোর হাত জোড় করে ওপরের বারান্দার দিকে মুখ তুলে বললে, 'আহা কত্তার আমার দয়ার শরীর!'

দিন কয়েক মা খুব ভয়ে ভয়ে ছিলেন? যতই জপধ্যান করুন, যুগধর্ম বলে একটা জিনিস তো আছে! প্রায় জিজ্ঞেস করতেন, 'হ্যা রে, পুলিশ আবার ধরে টানাটানি করবে না তো?'

ভয় পাবারই কথা। কাগজ টাগজ পড়েন। দেখেন তো, শাশুড়ীরা আজকাল কি হারে নিগৃহীতা হচ্ছেন। ধরে সেন্ট্রাল জেলে চালান করে দিলেই হল। বউদের ইউনিয়ান হয়েছে। শাশুড়ীদের কোন ইউনিয়ান নেই। আমি মাকে সাহস দিতুম, 'তুমি ভেবো না মা। যেখানে যা পুজো দেবার নিয়ম, সব দিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ফেলেছি। ভগবান আমাদের সহায়। হিন্দু ম্যারেজের সুবিধাটা কি জানো, কোথাও কোনো রেকর্ড থাকে না।' সাহস দিলে কি হবে। আবার এ ও ভাবতুম মানুষ বড় সাংঘাতিক জীব। যীশুকেই ক্রুশে ঝুলিয়ে দিলে। এখন মায়ের মতো ধার্মিক আর আমার মতো মাতৃভক্তকে ধরে পুরে দিলেই হল। যুগধর্মের কাছে জপের মালার ধর্ম কি দাঁড়াতে পারবে।

যাক টাকার ধর্মে সবই হয়। আমার প্রথম পক্ষটা এমনই বোকা ছিল, এত অজ্ঞ, যে তার এইটুকু জ্ঞান ছিল না আত্মহত্যা করার

আগে একটা চিরকুটে লিখতে হয়, 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেহ দায়ী নয়। এটা লিখে মরতে না হয় আর পাঁচটা মিনিট দেরি হত। আমি যার জন্যে এত ভাবলুম সে আমার জন্যে এইটুকু ভাবতে পারল না। দুনিয়ায় স্বার্থ ছাড়া কিছুই নেই। মনটা এত খিঁচড়ে গেল যে প্রথম পক্ষকে ভুলেই গেলুম।

আজকাল কাগজে পাত্র পাত্রীর কলাম হয়েছে। দোজপক্ষে আপত্তি নেই দেখে গোটা কতক চিঠি ছাড়লুম। একটা লেগে গেল। আসলে বিয়ে একটা নেশা। সিগারেট খাওয়ার মতো। একটা ধরালে আর একটা। আর একটা ধরালে আর একটা। মনটা ফস ফস করে। মেয়েটাকে দেখে এলুম। বয়েস হয়েছে। বেশ শক্ত সমর্থ। খুব ফ্রি। জড়তা নেই। আঙুলে শাড়ির আঁচল পেঁচাবার লজ্জা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এই প্রথম আমি প্রেমে পড়লুম। মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মতো অবস্থা হল। কথায় কথায় জানলুম, ইনি অ্যামেচার অভিনেত্রী। এক সময় স্পোর্টসে অল্প স্বল্প নাম হয়েছিল। একশো মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হতো। আমি বললুম, 'পছন্দ। আমি একটা পয়সাও নেবো না।'

কে একজন বললে, 'দিচ্ছে কে?'

মুখের ওপর এই রকম বলায় খুব রাগ হল। অপমানিত বোধ করলুম। পরে জেনেছিলুম, কথাটা বলেছিল মেয়েটার ভাই। একটা ভেঁপো ছেলে। যাক! আমি তাকে তখনকার মতো ক্ষমা করে দিলুম। সেই প্রথম বুঝেছিলুম, ভালোবাসা মানুষকে কত উদার করে দেয়। ওই জন্যেই শ্রীচৈতন্য বারে বারে বলেছিলেন, ওরে পাগলা, প্রেম কর, প্রেম কর। ভালোবেসে যা। মেরোছো কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দোবো না। আমার আগের বিয়েটা শুধুই বিয়ে ছিল। এ বিয়েটা হল প্রেম।

বসে পড়লুম পিঁড়েতে। প্রথম ধাক্কাটা খেলুম শুভ দৃষ্টির সময়। চাদরের তলায় আমার দ্বিতীয়পক্ষ, বলতে লজ্জা করছে চোখ মেরে দিলে। ঠাস করে। কেমন যেন ভড়কে গেলুম। চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে এসে পুরোহিত মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললুম। তিনি একটু ব্যঙ্গ করেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খান খান, আজকালকার বিয়ে আবার বিয়ে! দামড়া দামড়ীর

হাত ধরাধরি।' বৃদ্ধ মানুষ। কাঠ খোঁচা চেহারা। শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। বাকি সবাই হ্যা হ্যা করে হাসল। আমাব মনে তখন উড়ো ঝাপটা একটা গানের কলি ভাসছে, 'বুকে শেল মেরেছে, হৃদয়ে শেল মেরেছে।'

তিন টানে অত বড় একটা সিগারেট শেষ করে বসে গেলুম, যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদহৃং করতে। মেয়েকে কে যে আমার হাতে সম্প্রদান করছেন বুঝতে পারলুম না? মেয়ের হাত আর আমার হাত এক হওয়া মাত্রই, হাতের তালুতে কুড়ু কুড়ু করে দিলে। কোথা থেকে চার পাঁচটা সাঙ্ঘাতিক ফচকে মেয়ে এসে, আমার কান দুটো ধরে আচ্ছা করে মলে দিল। আর চেনা নেই শোনা নেই পাঞ্জাবী পাজামা পরা মহা একটা চ্যাংড়া ছেলে এসে বাসর ঘরে সারা রাত আমার বউয়ের সঙ্গে হ্যা হ্যা করে কাটিয়ে দিলে? মনে হচ্ছিল, আমি বিয়ে করেছি না ওই পল্লবকুমার করেছে? মিনিট পনের-র জন্যে বউকে খালি পেয়ে একটু রাগ রাগ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোঁড়াটা কে?'

বউ বললে, 'তুমি কি এইরকম গেঁয়ো ভাষায় কথা বলো না কি?'

বিয়ের ঘণ্টা চারেকের মধ্যে আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করাটা আমার কাছে ধৃষ্টতা বলেই মনে হল। আমি তো জানি ফুলশয্যার রাতের শেষের দিকটায় অনেক সাধ্য সাধনা করে বউকে দিয়ে 'তুমি' বলাতে হয়। সেই 'তুমি'-তে আলাদা একটা রস থাকে। আমার আবার সেই 'হিট' গানের লাইনটা মনে পড়ছে— 'বলি কি বলি না, বলা তো হল না, হায়!'

যাক, বসে আছি বউয়ের এলাকায়, এখানে কান ধরে টানার, চুল ধরে টানার মতো অনেকে আছে। তাই রাগ সামলে বললুম, 'ছোঁড়া, ছুঁড়ী শব্দটা এমন কিছু খারাপ নয়।'

'ভাষা দিয়ে কালচার বোঝা যায়। দেখি তোমার হাত আর পা দেখি।'

তার মানে? বেশ ঘাবড়ে গেলুম। এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, শুনেছি, তিনি পা দেখে ওষুধ দেন। পা দেখে রোগ ঠিক করেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হাত পা দেখবে কেন ?'

'কালচার মাপবো।'

সে আবার কি রে বাবা। ফুলপাড় কোঁচার তলা থেকে পা বের করে সামনে রাখলুম।

'হুঁ এ তো দেখছি দামড়া পা। তোয়ালে, সাবানটাবান ওই এরিয়ায় যায় ? যায় না! এই ময়লা গোদা পা তুমি বিছানায় তুলবে ? এই পায়ের পাতা দিয়ে তুমি আমার পায়ের পাতা স্পর্শ করবে ? ম্যা গেঃ।'

তার সারা শরীর শিউরে উঠল। মনে মনে আমিও ছোট হয়ে গেলুম। হল শরীরের স্ট্যাণ্ড। টেবিলের টপটা নিয়েই লোকে মাথা ঘামায়। পায়া নিয়ে কার মাথা ব্যথা ?

'পরশু পা ঠিক করে বিছানায় উঠবে। তা না হলে অ্যালাউ করব না। সারা রাত মালা পরে মেঝেতে বসে থাকতে হবে।

আমার সাফ কথা। হাইজিনের ব্যাপারে আমি স্ট্রিক্‌ট। হাত দেখি, ডান দিকের চেটো।'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'সিগারেট আমি বেশি খাই না। তুমি যা ভাবছো তা নেই।'

'কি ভাবছি !'

'আঙুলের পাশে নিকোটিনের দাগ। আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তোমার ভাবনা হচ্ছে আর কি !'

'রামো ! তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার ভাবনা হবে কেন। আজকালকার মেয়েরা বিধবা হয় না। এটা তো আমার সেকেণ্ড ম্যারেজ। থার্ডও বলতে পারো। টমকে আমি সেই ষোল বছর বয়সেই রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছিলুম। ছ'বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর আলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল পুরী হোটেলে। টমের হিংসে। ছেলেরা তো একটু জেলাস হয়। তা ছাড়া বেশির ভাগ ছেলেই বোকা। টম সুইসাইড করলে। পুত্তর চ্যাপ। আলোককে ভালো লাগল না। বছর তিনেক খেলিয়ে ছেড়ে দিলুম। বিকাশ এল। বিকাশ ছেলেটা ভালো ছিল। ভালো ইনকাম করত। মিথ্যে বলব না, আমার পেছনে লাখ তিনেক খরচ করেছিল। মোস্ট ট্রাবলসাম ছিল ওর মাটা। বুড়ীটা আমার লাইফ হেল করে

দিয়েছিল। বললুম, হয় তুমি আমাকে কাশীটাশী কোথায় নড়া ধরে ফেলে দিয়ে এসো, আর না হয় আমার আশা ছাড়ো। রোজ রাতে বুড়ী পাশের ঘরে অ্যাজমার কাশি কাসবে, এ একেবারে অসহ্য। আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে। ফরাসী দেশ হলে আমি তোমার বিরুদ্ধে বিশলাখ টাকার একটা ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করে দিতে পারতুম। এই ব্যাকওয়ার্ড দেশে সেটা সম্ভব নয়। তা সেই মাতৃভক্ত পাঁঠাটা আমাকে ছেড়ে দিলে।'

আমি ভয়ে ভয়ে একটা সিগারেট ধরালুম। হাত কাঁপছে। আমার দ্বিতীয় পক্ষ বললে, 'কি ব্র্যান্ড ?'

মুখ দিয়ে কথা সরল না। প্যাকেকটটা তুলে দেখালুম।

'খুব চিপ ব্র্যান্ডের সিগারেট খাও তো! ভালো সিগারেট থাকলে একটা টান টানতুম। মুখটা কেমন যেন ফ্যাক ফ্যাক করছে।'

'তুমি সিগারেট খাও ?'

'কেন খাবো না! সেই কলেজ লাইফ থেকেই তো ধরেছি। 'মাঝে হাফ টোব্যাকো ফেলে দিয়ে গাঁজা ভরে খেতুম। এখন সেটা ছেড়েছি। তবে খুব যখন ফ্রাসট্রেশান হয় তখন আবার খাই। বেশ লাগে। আমাদের এই অভিনয় লাইনে মন মেজাজ কখন কী রকম থাকবে বলা শক্ত।'

'তুমি অভিনয় করো না কি ? কই তোমার নাম তো শুনিনি, কোথাও কোন ছবিও দেখিনি।'

'তোমার তো কালচার নেই। আর্ট থিয়েটার কাকে বলে জানো ? ওয়ান ওয়াল কাকে বলে জানো ? কোনও দিন দেখেছো ? আমার নাম শুনবে কি করে ? তোমার দৌড় তো যাত্রা, হাতিবাগানের থিয়েটার, হিন্দি ছবি। কোনও দিন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস কি রবীন্দ্রসদনে গেছ ?'

নার্ভাস হয়ে বলে ফেললুম, 'না ভাই।'

আমার দ্বিতীয়পক্ষ ভেঙচি কেটে বললেন, 'কেন ভাই ?'

শেষে মরিয়া হয়ে বলে ফেললুম, 'আমারও কিন্তু মা আছেন।'

'নো প্রবলেম, আমি ঢুকলেই বুড়ি বেরিয়ে যাবে। সে আমি দাওয়াই দিয়ে দেবো। ও তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। বলে কি! শেষে আমি মিন মিন করে বললুম, ধরো আমি তোমাকে বিয়ে করি নি।'

'অত সহজ নয়। ধরতে হলে সঙ্গে অন্য জিনিস ও ধরাতে হবে। ব্যাপারটা তো কোর্টে চলে যাবে। শুনেছি তোমার বাড়ি আছে। বাড়িটা লিখে দাও, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশ ডাউন করো। তাহলে তোমার ওই ধরাটা ধরা যাবে।'

আমি গোটাকতক ঢোঁক গিললুম। এ তো দেখি আচ্ছা ফ্যাসাদে কলে পড়ে গেলুম। বললুম, 'ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিয়ে করা উচিত নয়। সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।'

'কেন? রথের যদি উল্টো রথ হয়, সংসার পুরাণের উল্টো পুরাণ হবে না কেন! ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখে নি। আমি তো রাত বারোটার সময় মাল খেয়ে টলতে টলতে ফিরবো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার নাম ধরে চেঁচাবো ভোমলা, ভোমলা। তারপর ঢুকেই তোমাকে পেটাবো। জাস্ট উল্টে নোবো গুরু। ভোর বেলা জড়ানো গলায় বলবো, অ্যায় লেবু চা লে আও। কি? ভয় পেয়ে গেলে মাইরি! বুমেরাং শুনেছো, বুমেরাং।' আমার দ্বিতীয় পক্ষ রাজিয়া সুলতানার মতো হাসতে লাগল। হঠাৎ হুলু লুলু, হুলু লুলু করে উলুর শব্দে চমকে উঠলুম। 'কি হচ্ছে? কিসের আওয়াজ?' আতঙ্ক। দ্বিতীয়পক্ষ বললে, শেয়াল কাঁদছে ভাই। যেখানে যত শেয়াল ছিল সব এক সঙ্গে কেঁদে উঠল ভাই। তোমার মা এখন কার গালে ঠোনা মারবেন ভাই। তুমি এখন কাকে ময়দা ঠাসা করবে ভাই। ভয় পেলে মানুষের সাহস বাড়ে। আমি আদি অকৃত্রিম স্বামীর ভাষায় ন্যাকা ন্যাকা গলায় বললুম—'হ্যা গা, এ কি তোমার অভিনয়!'